আকাশবাণী পর্যায়—২

গল্প-লেখার গল্প

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

সম্পাদিত

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৩

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুর্জ্জে ষ্ট্রীট,

মুদ্রাকর—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
ম্যাগনেট প্রেস
৩৫নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ও ব্লক—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

নিবেদন

কিছুদিন আগে বাংলার সেরা লেখকদের মধ্যে কয়েকজন 'আমার গল্প-লেখা' পর্যায়ে কতকগুলি বেতার-বক্তৃতা দেন। এগুলি অত্যন্ত চমৎকার ও শ্রুতিমধুর হয়েছিল। তা ছাড়া এ গুলির সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্যও যে যথেষ্ট আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। বক্তৃতাগুলি একত্রিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই সঙ্কলনের প্রচেষ্টা। আশা করি, পাঠকদের কাছে এর মূল্য স্বীকৃত হবে।

যথাসম্ভব বক্তৃতার কাল অনুযায়ী লেখাগুলি সাজানো হয়েছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রেখা-চিত্রও একখানি করে দেওয়া। কিন্তু তাঁদের অনেকে এ বিষয়ে অনিচ্ছুক বলে আমরা এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে পারি নি।

অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর কর্তৃপক্ষকে এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের অনুমোদন ও সহযোগিতা না থাকলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হ'ত না।

১লা শ্রাবণ, ১৩৫৩

বেঙ্গল পাবলিশার্স

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

৭ই এপ্রিল, ১৯৪৫

রেডিও ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে আদেশ ক'রেছেন—আমার প্রথম গল্প লেখা সম্বন্ধে ব'ল্‌তে। নিঃসন্দেহ অনেকের নাসিকা এতে কুঞ্চিত হয়ে উঠবে,—অনেকে ব'লবেন,—ভারী তো একটা লেখক, তার আবার প্রথম লেখার কথা!

তাঁদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।—

লোকোত্তর প্রতিভার ছটায় যাঁরা জগতকে বিস্মিত ক'রে দেন, তাঁদের জীবনের খুঁটি নাটি, তাঁদের প্রতিভার বিবর্ত্তন সম্বন্ধে কৌতূহলও হয়, তা জেনে উপকারও হয়। আবার তেমন প্রতিভার অধিকারী না হয়েও যাঁরা ভাগ্যবলে বিপুল জনগণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন,—তাঁদের সে সকল জীবনের আদি কথা শোন্‌বার আগ্রহ ভক্তদের হ'য়ে থাকে। আমার না আছে সে প্রতিভা, না আছে সে সৌভাগ্য বা প্রতিষ্ঠা। তাই আমার সাহিত্য জীবনের আদি কাহিনী শোনবার কৌতূহল কারো হওয়া উচিত নয়।—

কিন্তু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন তাঁদের,—কি জানি কেন, সে কৌতূহল হ'য়েছে।—তাই ব'লে যে সে কথা কারও শুন্‌তেই হবে এমন কোনও কথা নেই—রেডিও যন্ত্রের সামান্য একটা চাবী টিপ্‌লেই আপনারা এ উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে পারবেন। সেই ভরসায় আমি কৌতূহলীদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি।

কিন্তু বিপদ এই যে, আমার বিস্মরণ শক্তি এত প্রবল যে, কি যে আপনাদের বল্‌বো সে কথা ঠিক বুঝে উঠতে পার্‌ছি না।—

বিস্মৃতির পারাবার হাঁতড়ে আজ আমার পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আমার প্রথম লেখা কোনটা! আর কাকেই যে প্রথম লেখা ব'ল্‌বো সেটাও ঠিক বুঝতে পারিছি না। আমার লেখা শুরু হ'য়েছে,—বোধ হয় যখন আমার বয়স নয় কি দশ! বেশ মনে আছে তখন আমি দু'খানা তথাকথিত নাটক উৎপাদন ক'রেছিলাম। তার পর লিখেছিলাম অনেক কবিতা। দু'খানা উপন্যাস লিখেছিলাম, যখন আমার বয়স তের কি চৌদ্দ! সেই থেকে লিখে গেছি অবিশ্রাম। কিন্তু বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যক্রমে সে-সব লেখা আমার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে একেবারে মুছে গেছে। আর আমার দফতর আমার স্মৃতির চেয়েও চট্‌পট্‌ মুক্ত হ'য়ে যায়,—তাই আমার অপ্রকাশিত রচনার ছিটে ফোঁটাও কেউ কখনো খুঁজে বের করে পাঠকের চিত্ত ভারাক্রান্ত ক'র্‌বে সে আশঙ্কাই এখন নেই।

আরও বিপদ আছে। প্রকাশিত রচনার মধ্যেও যেটা প্রথম প্রকাশিত হ'য়েছে, সেইটাই আগে লেখা তা নয়! আর আগের লেখা গল্প যখন পরে প্রকাশ হ'য়েছে,—তা'র অনেকটা অদল বদল হ'য়ে গেছে। সুতরাং এদের ভিতরও কে যে, ঠিক অগ্রজ, আর কে যে অনুজ, সেটা নির্ণয় করাও খুব সহজ নয়।

আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প বোধ হয় বঙ্গদর্শনে বে'র হ'য়েছিল, শৈলেশ বাবুর সম্পাদনা কালে। কিন্তু সে গল্পের কাহিনীই আমার মনে নেই। তা'র চিহ্নমাত্রও আমার কাছে নেই। আর সেইটাই যে আমার প্রকাশিত গল্পের মধ্যে প্রথম লেখা,—তা-ও বোধ হয় নয়। প্রকাশিতের মধ্যে স্পষ্ট যা মনে আছে, তাতে প্রথম বে'র হয়—"দ্বিতীয় পক্ষ" ভারতবর্ষে। তার পরে "ঠান্‌দিদি" নারায়ণে। কিন্তু তা'র বহু আগে আমি লিখেছিলাম—"পাগল", "কাঁটার ফুল" এবং "ঝি!"

ঠিক এইটুকু ব'ল্‌লে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। কেন না,··· "পাগল" ও "কাঁটার ফুলের" প্রথম যে আকার ছিল, তা' বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে "কাঁটার ফুলের" প্রথম লেখাটা আমি পাঠিয়েছিলাম "প্রবাসীতে" গোপনে। প্রবাসী সম্পাদক লেখাটা ছাপেন নি! তাতে

নিরুৎসাহ হ'য়ে আমি আর কোনো লেখা ছাপতে পাঠাইনি। তাই "কাঁটার ফুল" ও পাগলের আদি ও অকৃত্রিম সংস্করণও কালক্রমে বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তার তিন চার বৎসর কি আরও বেশী পরে আমি আমার মন-হাঁতড়ে গল্প দু'টিকে পুনরুদ্ধার ক'রেছিলাম, কিন্তু বলা বাহুল্য —ঠিক আদি ভাষায় নয়।

ইতিমধ্যে আমি গোটা কয়েক প্রবন্ধ লিখে একটু খ্যাতিলাভ ক'রেছিলাম। ভারতবর্ষে—"শাস্ত্রের দোহাই" ছাপা হওয়ার পর বেশ একটু হৈ চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। তারপর পর পর অনেকগুলি প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ", "প্রবাসী", "সবুজপত্র", "সঙ্কল্প" ও "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশ হবার পর, যখন সাহিত্যিক ব'লে একটু প্রতিষ্ঠা হলো আমার,—তখন ভারতবর্ষে একটা সদ্য-লেখা গল্প পাঠালাম "দ্বিতীয় পক্ষ"!

মনে ভারী সংশয় ছিল,—হয়ত' গল্পটা ভাল হয় নি। হয় তো ছাপা হ'লেও এতে আমার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক খ্যাতির হানি হবে, সেই ভয়ে লিখে দিলাম, নামটা যেন দয়া ক'বে না ছাপেন। তারপর নারায়ণে যখন "ঠান্‌দিদি" গল্পটা দিই তখনও সেই অনুরোধ ক'রেই দিয়েছিলাম। "ভারতবর্ষ" সম্পাদক আমার অনুরোধ রক্ষা ক'রেছিলেন, "নারায়ণ" সম্পাদক করেন নি,—সেটা স্বনামেই বে'র হয়েছিল। এর পর জলধর বাবু আমাকে ফর্‌মায়েস্ দিলেন, উপন্যাসের। সেই আমার ঔপন্যাসিক জীবনের প্রকাশ্য সূত্রপাত!

কাজেই প্রকাশের তারিখ বিচার ক'রে আমার প্রথম লেখা ধরা যাবে না। কিন্তু কোন্‌টা যে ঠিক প্রথম লেখা, তাও ঠিক আমার স্মরণ নেই। যাঁরা আমাকে আমার প্রথম লেখা সম্বন্ধে ব'ল্‌তে অনুরোধ ক'রেছেন, তাঁদের হয়তো এই কথাটা জানবার কৌতূহল আছে যে, কেমন ক'রে আমার প্রথম লেখার কল্পনা আমার মনে গ'ড়ে উঠলো আর কেমন ক'রে তা' লেখায় রূপ নিল। একথা ঠিক বলা সহজ নয়। কেননা প্রথমতঃ প্রথম লেখা যে কোন্‌টা, সেইটেই আমি ঠিক ক'রে বল্‌তে পারি নে'। আর সে লেখার কল্পনাটা কবে কি আকারে আমার

মনের ভিতর রূপ নিয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার স্মৃতি যে খুব স্পষ্ট বা নির্ভরযোগ্য, তাও ঠিক ব'লতে পারি না।

"পাগল" "কাঁটার ফুল" ও "ঝি" এই তিনটি গল্পের মধ্যে একটাই বোধ হয় আমার প্রকাশিত লেখার মধ্যে প্রথম। যখন তাদের পরস্পরের অগ্রজত্বের দাবী সম্বন্ধে কোনও রোয়দাদ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তাদের প্রত্যেকটির জন্মের ইতিহাস যতদূর আমার স্মরণ আছে,—তাই একটু বলি!

আমার কোনও গল্পই গ্রীক পুরাণের মিনাভার মত বর্ম্মে-চর্ম্মে পূর্ণাঙ্গ হয়ে আমার মনে আকারিত হয় না। একটা ছোট ঘটনা বা অবস্থার কথা মাথায় এসে তা' লতা-পল্লবিত হ'য়ে উঠে ক্রমে লেখবার যোগ্য আকার ধারণ করে। এই যে লতা পল্লব, তা-ও প্রায় মনে মনে ধ্যান করে জন্মায় না, জন্মায় বেশীর ভাগ কলমের ডগায়। গোড়ার কথাটা মনের ভিতর আকারিত হ'লেই আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসি, তারপর কলম চ'লতে চ'লতে কথা চিত্র ও চরিত্র আমায় মাথার চারপাশে ভিড় ক'রে এসে কলমের মুখে আত্ম-প্রকাশ ক'রে ফেলে। "কাঁটার ফুলের" জন্মের ইতিহাসটা খুলে ব'ল্‌লেই কথাটা পরিষ্কার হবে। এ গল্পের কল্পনাটা আমার মাথায় এসেছিল প্রথম মধুপুরে, এবং খুব সম্ভবতঃ মধুপুরেই এর আদি সংস্করণ লেখা হ'য়েছিল। সেখানে আমাদের একটি চাকর ছিল—দুখী। একদিন তার স্ত্রী তার কাছে এসেছিল। মলিন বেশে সে এসেছিল, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে তার রূপ ফেটে পড়ছিল। আমার জানালার পাশে তাদের সম্ভাষণের খানিকটা শুনেছিলাম। স্ত্রী কিছু একটা চেয়েছিল, দুখী ব'ল্‌ছিল—তার পয়সা নেই,—কোথা হ'তে কিন্‌বে?—

শুধু এইটুকু থেকে গল্পের একটা খাঁচা মনে তৈরী হলো। একটি গরীব চাকর, তার অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রী। স্ত্রীর আবদার মেটাবার সঙ্গতি তার নেই। অথচ ইচ্ছা ও ভালোবাসা আছে ষোলো আনা।—

এই কল্পনার পাশে এসে দাঁড়াল আমার অনেক দিন আগেকার দেখা কয়েকটি ছবি। আমাদের একটি পুরাণো চাকর ছিল; তার নাম গুমানী;

অনেক বয়সে সে বিয়ে ক'রেছিল। তখন আমি ছিলাম খুব ছোট, কিন্তু আমি শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম,—যে যাকে সে বিয়ে ক'রেছে সে কুমারী নয়, তার স্বামী বেঁচে আছে, কিন্তু তাকে গাওনা ক'রে নেয় না।—সেই সময়েই আমি নিম্ন শ্রেণীর বেহারীদের বিবাহ ব্যাপারের কতক সংবাদ জান্‌তে পেরেছিলাম। দুখীর কাহিনীর সঙ্গে গুমানীর এই ইতিহাস জুড়ে গেল, কল্পনা ঘোরালো হ'য়ে উঠলো।—

আর একটা ছবি খুব ছেলে বয়স থেকে আমার মনে সঞ্চিত হ'য়েছিল। সেটা এই কল্পনা স্রোতের সঙ্গে এসে মিলিত হলো।—

আমার বয়স যখন বছর বারো, তখন আমি মোতিহারীর স্কুলে পড়ি। আমাদের বাড়ী যেখানে ছিল, সেখান থেকে নীল ক্ষেতের পাশ দিয়ে কতকটা নির্জ্জন একটা রাস্তা কালেক্টর সাহেবের বাড়ী হ'য়ে ছাতৌনী, পতোরা প্রভৃতি গ্রামের দিকে চ'লে গেছে। এক দিন সূর্য্যাস্তের কালে এই পথ দিয়ে একা বেড়াচ্ছিলুম। খানিক দূরে গিয়ে রাস্তার পাশের ঘন গাছের সারির ভিতর দিয়ে একটা সরু দোপেয়ে পথ দেখতে পেয়ে, সেই পথে চ'ল্‌তে লাগলাম ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে। সামান্য খানিকটা পথ গাছের ও ঝোপের ভিতর দিয়ে গিয়ে হঠাৎ আমার সাম্‌নে দেখলাম একটা বেশ বড় খোলা মাঠ। চারিদিকে তার ঘন বৃক্ষের আবেষ্টনী, মাঝখানে নির্জন, নিভৃত এই মুক্ত প্রান্তর,—তার প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটি ডোবা। এ স্থানে একটা অপূর্ব্ব পরিপূর্ণ নির্জনতার ভিতর দিনান্তের পাখীদের ছাড়া ছাড়া কলগান ছাড়া অন্য শব্দ নেই। দু' একটা গরু ছাড়া অন্য জীব নেই--শুধু গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা কুটীরের আতাল!—কী একটা আবেশ আমাকে পেয়ে ব'স্‌লো। মুগ্ধ, তন্ময় চিত্তে আমি সেখানে ব'সে পড়লাম।—

যে ভাব সে দিন আমার কিশোর চিত্তে জেগে উঠেছিল, সেটা তখন ভাষায় আকারিত হয়নি কিন্তু তার অনুভূতি ছিল এত নিবিড় যে, কোনও দিনই আমি ভুলি নি, কোনও দিনই সে ছবি তাই আমার মনে মলিন হ'তে পারে নি'। তার অনেক দিন পরে কলেজে যখন Wordsworth এর কবিতা পড়লুম, তখন আমি তীব্র আনন্দের সঙ্গে তাঁর একটি

কবিতায় আমার সেদিনকার সেই অনুভূতি Wordsworth এর ভাষায় রূপায়িত দেখতে পেলাম। সে কবিতাটির নাম Nutting ; তার অনেকটাই আমার "কাঁটার ফুলে" উদ্ধৃত ক'রেছি।

গল্পের খাঁচাটা তৈরী হ'তে হ'তে আমার আদি কৈশোরের এই ক্ষণদৃষ্ট চিত্র ও এই অপূর্ব্ব অনুভূতি এসে এ গল্পের একটা যেন আসন পেতে দিয়ে গেল।

মাত্র এইটুকু সম্বল নিয়ে আমি লিখতে লেগে গেলাম গল্প! তারপর একটা কথায় আর একটা মনে হ'ল, প্লট ঘনীভূত হ'য়ে গেল। যা' কিছু লিখলাম সবই মনে এলো অনাহুত হ'য়ে কলমের চলতি পথে! তাদের সৃষ্টি ক'র্তে হয়নি,—অন্ততঃ আমার সচেতন চেষ্টায় তাদের জন্ম হয়নি! সেই সব কথা ও কাহিনীর সমষ্টিতে যদি কিছু রূপ বা রসের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তার কৃতিত্বের দাবী আমি খুব কমই ক'রতে পারি!—আমি যে নিশ্বাস নিই বা অন্ন পরিপাক করি, তাতে আমার যতটুকু কৃতিত্ব, এই সব কথা ও গল্প 'সৃষ্টির জন্য আমার নিজস্ব কৃতিত্ব তা'র চেয়ে খুব বেশী নয়। স্বপ্ন দেখতে হ'লে যতটুকু বাহাদুরী দরকার হয়, আমার গল্প লেখায় তার চেয়ে খুব বেশী বাহাদুরী নেই। তফাৎ এই যে, স্বপ্ন আসে অসংবিদে, গল্প আসে সুস্পষ্ট চেতনায়।—

"পাগল" গল্পটির ইতিহাস বেশ মনে আছে আমার।—একটি জমিদারের কয়েকটি ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় ছেলেটির বুদ্ধি শুদ্ধি কম, তাকে বাড়ীর লোকেও কতকটা হতশ্রদ্ধা করে। এই ছেলেটির যখন বিয়ে হলো, তার পরিজনদের কাছে শুন্তে পেলাম যে, তার স্ত্রীটি বড প্রখরা। এক দিন নাকি বড ছেলে ও তার স্বামীর জন্য কি একটা পরিবেশনের তারতম্য নিয়ে সে উগ্র হ'য়ে উঠেছিল। বউটির সঙ্গে আমার পরিচয় হ'লে যা দেখলাম,—তা' থেকে আমার মনে জন্ম নিল নারায়ণী।—তার চার পাশে যারা এসে জুটলো, তাদের অনেকেরই মূল আছে—যে সব লোক আমি দেখেছি তাদের ভিতর। রামগতি ভট্টাচার্য্য যাঁকে অবলম্বন ক'রে কল্পনা ক'রেছি,—তিনি সেকালে অনেকেরই পরিচিত ছিলেন!—তাঁর স্ত্রীর মূলটিও আমার পরিচিত। এই সব

মাল-মসলা নিয়ে গল্প লিখতে লিখতে ক্রমে সে আপনি এগিয়ে চ'ললো।—

গল্পটি লেখা হ'লে আমি আমার স্ত্রীকে প'ড়ে শুনালাম।—শুনে তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। তখন মনে হ'লো আমার গল্পটা সার্থক হ'য়েছে। কিন্তু ছাপতে দিতে তখনও সাহস হলো না। তারপর সে লেখা হারিয়ে গেল।—"অগ্নি সংস্কার" বের হবার পর যখন একটু সুনাম হলো, তখন আবার আমার সেই হারাণো গল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলাম। গল্পটি এত নিবিড় ভাবে আমার মনে ছাপ মেরেছিল যে, তার নব কলেবর দিতে আমার কোনই কষ্ট হলো না। তার পর সেটা ভারতবর্ষে ছাপা হলো।—

"ঝি" গল্পটির সম্বন্ধে বেশী কিছু মনেও নেই,—বলবারও নেই।—এটা খুব বেশী মাত্রায় কাল্পনিক, এবং হয়তো অনেকেই বলবেন কৃষ্ট কল্পিত। এর মাল-মসলা সম্বন্ধে দু' একটা কথা আমার মনে আছে। আমি তখন ভবানীপুরে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে ভবানীপুরে ছিলাম। সেই বাটির ও সে পাড়ার আবেষ্টন গল্পের ভিতর আছে। একদিন দ্বিপ্রহরের নিদ্রাভঙ্গে শুনতে পেলাম, আমাদের বাড়ীর দোতলার সিঁড়ির কাছে কে একজন আমার মার সঙ্গে কথা কইছে। জেগে উঠে দেখলাম, ঝি নিযুক্ত করা হচ্ছে। যে কাজ করতে এসেছে, সে আছে নীরবে অতি সঙ্কুচিত ভাবে। একটু ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে, কথা কইছে তার সঙ্গিনী, পাশের বাড়ীর ঝি!—শুধু এইটুকু থেকে গল্পের সূত্রপাত।

এর বেশী আমার কিছু বলবার নেই। যাঁরা ধৈর্য্য ধ'রে এতক্ষণ শুনলেন,—তাঁহাদের শোনবার মত, মুগ্ধ করবার মত কি চমক লাগাবার মত কোন কথাই আমি বলতে পারলাম না, সে কথা আমি জানি। কিন্তু সেজন্য দায়ী আমি নই,—যাঁরা আমাকে ডেকে এনেছেন একথা ব'লতে, তাঁরা। তাই ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনাদের নমস্কার জানাচ্ছি।—

১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৫

আমার প্রথম গল্প। সত্যি কথা বলতে কি প্রথম গল্প যে কবে লিখেছিলুম, গল্পের বিষয়বস্তু কি ছিল, গল্পটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল কিংবা আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি না তা স্মরণ নেই।

মনে পড়ে, ছেলে বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। কবিতা লেখবার একখানা বাঁধানো খাতাও ছিল। সে সব কবিতা ছাপার অক্ষরে দেখবারও দুঃসাহস মধ্যে মধ্যে মনের মাঝে যে উঁকি দিত না, এমন কথাও হলপ ক'রে বলতে পারি না। কিন্তু একটা ব্যাপারে একদিন সব ভণ্ডুল হোয়ে গেল।

আমাদের ছেলেবেলা মধ্যে মধ্যে পূজোর সময় দেওঘর যাওয়া হোতো। তখনকার সঙ্গে এখনকার দেওঘরের আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। দু-চারটে পল্লীছাড়া ঘন বসতি তখন সহরের কোথাও ছিল না। অনেক দূরে দূরে এক একটা ছোট্ট বাড়ী—দূর থেকে সাদা ধপধপে দেখতে। চারিদিকেই উন্মুক্ত উঁচু নীচু মাঠ পড়ে রয়েছে। সহরের প্রায় সর্বত্রই ধানক্ষেত, তার ভেতর দিয়ে সরু সরু আল। শরতের মাঝামাঝি ধান-ক্ষেতের সে শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিকে—সহরের যেখানেই দাঁড়ানো যায়, দূরে কাছে সব উঁচু নীচু পাহাড় দেখা যায়। চারিদিকেই অপর্যাপ্ত কবি মনের খোরাক ছড়িয়ে। আমি যদি সত্যি-কারের কবি হতুম তা হোলে কবি করুনানিধানের মতন দেওঘরের উপর একটা অমর কবিতাও লিখে ফেলতে পারতুম। অর্থাৎ প্রথম

দেওঘরে গিয়ে ভাবটা খুব জোরই লেগেছিল কিন্তু হায় কাব্যের ভাষা যোগাল না।

দেওঘরে তখন দেশপূজ্য ঋষিতুল্য রাজনারায়ণ বসু মশায় বাস করতেন। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ট পরিচয় থাকায় আমরা প্রায় রোজই যেতুম তাঁদের বাড়ী। সে সময় রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁকে বিকেল বেলা তোলা চেয়ারে ক'রে বাড়ীর সামনের বড় মাঠটায় বসিয়ে দেওয়া হোতো এবং সন্ধ্যে হোলে চাকরেরা আবার তুলে নিয়ে যেত—বোধ হয় সেই বছরেই তিনি মারা গেলেন। রাজনারায়ণ বাবুদের বাড়ী ছিল সাহিত্যিক আবহাওয়ায় পূর্ণ। তাঁর বড় ছেলে যোগেন বাবু, ছোট ছেলে মণিবাবু, ছোট মেয়ে কুমারী লজ্জাবতী সকলেই সাহিত্যের চর্চা করতেন। তাঁদের বাড়ীতে লোকজনের অন্ত ছিল না কিন্তু যখনই সেখানে গিয়েছি দেখেছি—বাড়ী একেবারে নিঃশব্দ, সবাই নিজের নিজের ঘরে বসে কেউবা পড়ছেন কেউবা লিখছেন।

রাজনারায়ণ বাবুর ছোট ছেলে মণীন্দ্রনাথ সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখে নাম করেছিলেন। ভদ্রলোকের আবার ছিল কুস্তীর সখ। তাঁদের বাড়ীর পেছনে প্রকাণ্ড বাগানের কোণে ছিল আখড়া আর আখড়ার পাশেই ছিল মাঝারি গোছের একখানা খোলার চালার ঘর। সকাল বেলা কুস্তি-টুস্তি ক'রে তিনি এই ঘরখানাতে ঢুকতেন। এইখানে পালোয়ানের দল পরিবেষ্টিত হোয়ে প্রায় সারাদিন সেই মাটি মাখা গায় বসে থাকতেন। সব কাজই তাঁর এই ঘরে চল্‌ত। দুপুরের খাওয়া বাড়ী থেকে আস্‌ত। সমস্ত দিন বাদে সেই সন্ধ্যা বেলায় স্নান ক'রে পরিষ্কার জামা কাপড় পরতেন। মণীন্দ্র নাথকে আমরা মণিদা বলে ডাকতুম। কুস্তি ক'রে আর তার সঙ্গে দু-বেলা পালোয়ানোচিত আহারের ফলে চেহারাখানা হোয়ে উঠেছিল পাহাড় সদৃশ। খালি গায়ে মাটি মেখে যখন তিনি বসে থাকতেন তখন মনে হোতো যেন প্রকাণ্ড একখানা কষ্টি পাথরের টুক্‌রো পড়ে রয়েছে।

মণিদার সঙ্গে আমাদের বয়সের তফাৎ ছিল অনেকখানি। কিন্তু

এই তারতম্যের জন্ত কিছুই বাধতো না কারণ তাঁর মেজাজটি ছিল শিশুর মতন—এমন অমায়িক লোক খুব কমই দেখেছি। আমাদের কাছে তিনি অনেক বিদেশী সাহিত্যের গল্প করতেন। তা ছাড়া আরও অনেক মজার মজার গল্প বোলতেন। আমার যে কবিতা লেখার বাতিক আছে সে কথা মণিদা জানতে পেরে একদিন বল্লেন—এই দেওঘরের ওপর একটা কবিতা কাল লিখে এনে শোনাবি।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর চারিদিক নিঝুম হোয়ে গেলে পডবার ঘরে বসে দেওঘর সম্বন্ধে কবিতা লিখলুম—সন্ধ্যা হইল

নন্দন পর্বত গুহে ব্যাঘ্র প্রবেশিল।
জীবজন্তু মানবাদি নিদ্রায় মগন
শর্বরী সঘন।

এই শর্বরী কথাটা কিছুদিন আগে এক পাঠ্যপুস্তকে পড়া গিয়েছিল। কথাটা বেশ লেগেছিল বলে তাগ্ মাফিক কোনো কবিতায় লাগাবার জন্ত মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা উদ্যত হয়েছিল। এবার মনে হলো শব্দটি যেন তালমাফিক লাগানো হয়েছে। কবিতাটা কিন্তু আর বেশী দূর অগ্রসর হলো না। কি একটা বাধা পড়ায় তখনকার মতন লেখা বন্ধ করতে হলো।

যাই হোক, পরের দিন সকালবেলা সেই অসমাপ্ত কবিতা নিয়েই ছুটলাম মণিদার কাছে। মনটা আত্মপ্রসাদে ভরা, নিশ্চয় কবিতা শুনে মণিদা তারিফ করবে।

ওদের ওখানে যখন পৌছলুম তখন বেলা প্রায় আটটা, চারিদিকে চড়চড়ে রোদ উঠেছে। মণিদা কুস্তি টুস্তি সেরে মাটিমাখা আদুড় গায়ে বসে আছেন—গায়ের ঘাম তখনো মরেনি।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর যে দু-একজন বাঙালী ভদ্রলোক সেখানে বসেছিলেন তাঁরা উঠে গেলেন। আমিও সন্তর্পণে কবিতার খাতাখানি মণিদার হাতে দিলুম। আমার বুকের মধ্যে তখন দুর্ দুর্ করছে— মণিদা একবার সেটা মনে মনে পড়েই হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হাসি ছিল বিখ্যাত, লোক মুখে শুনেছি

বহুদূর থেকে তাঁর হাসির আওয়াজ পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁর ছেলে মণিদার হাসি ছিল নিঃশব্দ। তবে একবার হাসি আরম্ভ হোলে তা আর থামতে চাইত না। আর তাঁর সেই বিরাট দেহখানা থর থর ক'রে কাঁপতে থাকৃত। মণিদা আমার খাতাখানা হাতে নিয়ে সেই রকম হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। আমার মনে হোতে লাগল যেন চোখের সামনে একটা ছোট্ট কষ্টিপাথরের পাহাড়ে ভূমিকম্প হচ্ছে।

হাসি থামতে জিজ্ঞাসা করলুম, কিচ্ছু হয়নি বুঝি ?

মণিদা বোধ হয় আমার চোখমুখের অবস্থা ও জিজ্ঞাসা করবার ধরণ দেখে বল্লেন—না না বেড়ে হয়েছে—খাসা হয়েছে। আমাদের ঐ উইয়ের ঢিবিকে তুই পর্বত বানিয়ে দিয়েছিস্—এমন কবিতাকে আমি খারাপ বল্‌ব। বেড়ে হয়েছে।

মনটা তবুও সুস্থ হোলো না। মনিদা বল্লে—কিন্তু সন্ধ্যে হোলে তো ব্যাঘ্ররা গুহা থেকে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তোর ব্যাঘ্র সন্ধ্যে হোতে না হোতে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল কেন বল দিকিনি ? কোথাও চাকরী বাকরী ক'রে বুঝি ? সারাদিন খেটে খুটে বাড়ী ফিরে এলো বুঝি ?

কথাটা শুনে সত্যিই লজ্জা পেলুম। কারণ বাঘরা যে সন্ধ্যার পরেই অন্ধকারে শিকার খুঁজতে বেরোয় একথাটা সকলেই জানে। আমিও যে না জানতুম তা নয় কিন্তু কবিতা লেখার উৎসাহে সেটা ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম।

কিছুক্ষণ বাদে মণিদা বল্লেন—দেখ এক কাজ কর। কবিতা লেখা এখন ছেড়েদে ; আরও একটু বড় হোলে কবিতা লিখিস্। এখন গল্প লেখ।

বল্লুম—গল্প লিখতে ইচ্ছে আছে খুব কিন্তু প্লট পাই না।

মণিদা বল্লেন—প্লট ! প্লটের ভাবনা কিরে ! প্লট তো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—আচ্ছা। ঐ নন্দন পাহাড় নিয়েই একটা গল্প লেখ।

আজ নন্দন পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর মন্দির তৈরী হয়েছে কিন্তু তখনকার দিনে ঐ জায়গায় একখানা ইঁটের ঘর ছিল। ঘরের চারিদিক-

কার দেওযালগুলো ঠিক ছিল কিন্তু ছাদটা গিয়েছিল পড়ে। কতদিন আগে কে যে ঐ ঘর তৈরি করেছিল এবং কেই বা থাকত সে ঘরে, সে কথা কেউ ঠিক ক'রে বলতে পাবত না। এই ঘরখানা সম্বন্ধে যে কত গল্প শুনতুম সে সময়ে, তার সবগুলো এখন মনে নেই। সহরের সব থেকে উঁচু জায়গায় ওই রহস্যময় ভাঙা ঘরখানার সত্যিকারের কাহিনী জানবার জন্য আমাদের শিশুমন কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হোয়ে থাকত এবং সে কৌতূহল কেউ-ই মেটাতে পারেনি সেদিন। মণিদা বল্লে—ঐ ঘর খানা নিয়ে বাগিয়ে একটা গল্প লিখে ফেল্ তো। ওটা তো মূর্ত্তিমন্ত একটা গল্প।

নতুন উৎসাহ পেয়ে বাড়ীতে চলে এলুম। বিকেল হোতে না হোতে নন্দন পাহাড়ে গিয়ে উঠলুম। কল্পনাকে খুঁচিযে জাগাবার জন্য মনের মধ্যে জোর চেষ্টা চলতে লাগল কিন্তু দিন দুই প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও আগাগোড়া একটা প্লট খাড়া করতে পারলুম না। শেষকালে হতাশ হোয়ে আবাব একদিন সকাল বেলা মণিদার শরণাপন্ন হোতে হোলো। বল্লুম—কিছুতেই কোনো প্লট মাথায় আসছে না।

মণিদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেন—আচ্ছা তা হোলে তোকে একটা গল্প বলি শোন—ঐ নন্দন পাহাড়েরই গল্প। আসলে এটা গল্প নয, সত্যিকারের ঘটনা।

মণিদা বলতে লাগলেন—ছেলেবেলায় আমাদের আড্ডা ছিল ঐ নন্দন পাহাড়েব উপরে। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিবে আমরা জনকয়েক রোজ বিকেলে জুটতুম ঐ নন্দন পাহাড়ে। এখন নন্দন পাহাড়ে যাবার চমৎকার রাস্তা তৈরি হয়েছে কিন্তু এ রাস্তা তখন ছিল না, চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত ধানক্ষেত ছিল একেবারে পাহাড়ের পাদমূল অবধি। এই ধানক্ষেতের ভেতর সরু সরু আল দিয়ে যাতায়াত করবার রাস্তা ছিল। প্রতিদিন প্রায সন্ধ্যে অবধি পাহাড়ের ওপরে আড্ডা দিয়ে আমরা যে যার বাড়ী চলে যেতুম।

একদিন এই এমনি সময়, প্রায শরতের মাঝামাঝি ধানের শিষ হয়েছে—পাহাড়ের চারিদিকে সবুজে সবুজ, আমরা আড্ডা দিয়ে উঠব

উঠব মনে করছি এমন সময় দূরে দেখতে পেলুম একটা মানুষ যেন বুকে হেঁটে নন্দনের দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটা কি রকম অস্বাভাবিক ঠেকতে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলুম। নন্দনের পাশেই তার চেয়ে কম উঁচু আর একটা পাহাড়ের টিপির মতন আছে দেখেছিস তো? দেখলুম লোকটা সেই পাহাড়ের গা বেয়ে যেন গড়াতে গড়াতে অতি ধীরে নন্দনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সূর্য্যদেব তখন পাটে বসেছেন, চারিদিকে তার লাল আভা ক্রমেই অন্ধকারে মিলিয়ে আস্‌ছে এমন সময় লোকটা আমাদের কাছে এসে একরকম শুয়ে পড়ে অস্ফুট স্বরে একবার বল্লে—জল।

দিনের আলো যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাইতে দেখলুম লোকটা কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত। দুটো হাতেরই প্রায় কনুই অবধি নেই, দু-পায়েরই হাঁটু অবধি প্রায় খসে গেছে। হাত পায়ের ঘা গুলো চট দিয়ে মোড়া—মুখেরও অনেক জায়গা খসে গিয়েছে। মানুষের এমন বীভৎস মূর্ত্তি এর আগে কখনো দেখিনি। একটা চোখের নীচে এমন ঘা হয়েছে যে, ভেতর অবধি দেখা যাচ্ছে। লোকটা পাথরের ওপরে এলিয়ে পড়ে আবার বল্লে—জল।

সেখানে পানীয় জল পাওয়া তখন অসম্ভব ছিল। নিকটে লোকের বসতি নেই, জল কোথায় পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গে ছোট্টু নামে একটি হিন্দুস্থানী ছেলে ছিল। সে বল্লে—আচ্ছা আমি জল এনে দিচ্ছি।

তখন নন্দন পাহাড়ের নীচেই ছিল একটা শ্মশান। সেখানে অনেক ভাঙা হাঁড়ি কলসী পড়ে থাকত! ছোট্টু সেখান থেকে একটা ভাঙা কলসী নিয়ে ধান ক্ষেত থেকে খানিকটা জল তুলে নিয়ে এসে তাকে দিলে। লোকটার হাত নেই, কি ক'রে জল খাবে! সে চিৎ হোয়ে পড়ে রইল আর আমরা আঁজলা ক'রে একটু একটু জল তার মুখে দিতে লাগলুম।

জলটল খেয়ে একটু সুস্থ হোয়ে লোকটা যা বল্লে তার মোদ্দা কথাটা এই যে, কোন্ দূর পল্লীগ্রামে তার বাস। আজ দু-দিন আগে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে দেওঘর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। দেশে তার

কেউ নেই, কেউ তাকে দেখে না, সকলেই তার সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করে। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে—হাসপাতাল এখান থেকে কত দূর ?

আমরা তাকে বোঝালুম—এই অন্ধকারে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে সহরে পৌঁছে হাসপাতালে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরঞ্চ আজকের রাত্রিটা তুমি এই ঘরে থাক, আমরা বাড়ী থেকে তোমার জন্য খাবার আর একটা লণ্ঠন পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল সকাল বেলা আমরা এসে তোমাকে এখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

লোকটা আমাদের কথায় রাজী হোয়ে গেল! ঘরের মধ্যে ভাঙা ছাদের ইট পাটকেলের স্তূপ সরিয়ে আমরা একটু জায়গা ক'রে দিলুম। বুকে হেঁটে ঘেঁষ্‌টে ঘেঁষ্‌টে সেখানে গিয়ে একটা ইট সরিয়ে নিয়ে এসে মাথায় দিয়ে সে শুয়ে পড়্‌ল।

বাড়ীতে যখন ফিরে এলুম তখন বেশ অন্ধকার হোয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কিছু খাবার আর একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়ে দু-জন চাকরকে পাঠিয়ে দিলুম সেখানে। সেই রাত্রেই একটা ডুলি ঠিক ক'রে রাখলুম—অতি প্রত্যূষে তারা আসবে। বন্ধুরা অনেকেই বল্লে—খুব ভোরে আমাদের এখানে আসবে।

রাত্রে চাকরেরা ফিরে এসে বল্লে—লোকটা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। তারা তাকে ডেকে তুলে দিয়ে সামনে খাবার রেখে চলে এসেছে।

ভোর হবার অনেক আগেই দলবল এসে জুটল আমাদের বাড়ীতে। আমরা কাহারদের তুলে ডুলি নিয়ে অন্ধকারেই পাড়ি দিলুম নন্দন পাহাড়ের দিকে। সামান্য একটু আলো যখন ফুটেছে অর্থাৎ খুব কাছের মানুষ চেনা যায় মাত্র—এমন সময় আমরা নন্দনের পাদমূলে গিয়ে পৌঁছলুম।

ডুলিওয়ালাদের নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে আমরা পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলুম। চূড়োয় পৌঁছনো মাত্র দেখলুম বোধ হয় চোদ্দ পনেরটা ইয়া কেঁদো কেঁদো মোটা শেয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলে ধান ক্ষেতের দিকে।

শেয়ালগুলোকে তাড়া দিতে দিতে হৈ হৈ ক'রে হাসতে হাসতে আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলুম তা পৃথিবীর বোধ হয় কেউই দেখেনি। দেখলুম খানিকটা মাংসপিণ্ড আর হাড় পড়ে রয়েছে। সারারাত্রি ধরে পালে পালে শেয়াল এসে সেই অসহায় লোকটাকে খুবলে খুবলে মেরেছে। সে বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা আর করব না। আমরা যখন গেলুম তখনো তার বুকের কাছটা ধুক ধুক করছিল—একটু পরে সেটুকুও থেমে গেল।

সেই ব্যাপারের পরে শহরে বাঙালীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। আর তারই ফলে আজকের এই কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই বলে মণিদা চুপ করলে।

এই আমার প্রথম গল্প। বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে সেই যে অতীত অপরিচিতের মর্মভেদী মৃত্যু কাহিনী শুনেছিলুম তাকে রূপসজ্জায় কখনো সাজাতে পারিনি। আজ স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার খুলে তাকে আকাশে মুক্ত ক'রে আমি দায়মুক্ত হলুম।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২১শে এপ্রিল, ১৯৪৫

বেতার কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কি সূত্রে কবে আমি গল্প লেখা শুরু করলুম—তাঁদের এই সন্ধ্যার আসরে ব'সে শ্রোতাদের গল্প শোনাতে হবে। আমরা বাঙালী—আমাদের স্বভাব হ'লো "গোল্পে"—অর্থাৎ গল্প, ব'লতে বা শুনতে পেলে আমরা আর কিছু চাই না। এ আহ্বান তাই আমি শিরোধার্য্য ক'রেছি।

এ সময়কার দিনের কর্মশেষে সকলের মন থাকে ক্লান্ত,—গভীর চিন্তার বিপুল গহনে মন যেতে চায় না—কেমন আলস্য বোধ হয়, সেজন্য এ সময়টায় চুপ-চাপ ব'সে গল্প শোনাটা মন্দ লাগে না। বেতার কর্তৃপক্ষ এ মনস্তত্ব ভালো করেই বোঝেন,—তাই তাঁদের বোধ-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে তাঁদের কথায় আমি আপনাদের কাছে আমার গল্প লেখার গল্প ব'লছি!—

সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।—তখন স্কুলে পড়ি, বাঙলা ভাষা ছিল তখনকার দিনে রূপকথার দুয়োরাণীর মতোই 'একবারে' সকলের কাছে উপেক্ষিতা, অবজ্ঞাতা, অনাদৃতা! ঘরে বাইরে কাণের কাছে অভিভাবক এবং মাষ্টার মশাইদের বাণী ধ্বনিত হতো—ইংরেজী শেখো—ইংরেজী—ইংরেজীতে কথা ব'লবে—ইংরেজীতে চিঠি লিখবে—ইংরেজী খবরের কাগজ পড়বে।—শুধু ইংরেজী আর ইংরেজী, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখা অভ্যাস করতে হবে। এমনি উপদেশ,—অনুজ্ঞা কাণে বাজতো অহরহ।

বাঙলায় যে সব পাঠ্যগ্রন্থ ক্লাসে পড়ানো হ'তো তাতে শুধু জন্তু জানোয়ারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরিশ্রম, অধ্যবসায়,—প্রভুপরায়ণতা আর অপত্যস্নেহের বৃত্তান্ত। নরলোকের গন্ধও ছিল না,—সে সব পাঠ্য গ্রন্থে।

মনে হতো রামায়ণ মহাভারতের পর এদেশে এমন মানুষ আর জন্মায় নি যাদের কথা নিয়ে বই লেখা চলে। ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে মন আমাদের এগজামিনের পড়া তৈরি নিয়েই হয়তো মরে যেতো—মরেনি শুধু দু'খানি মাসিক পত্রের দৌলতে। সে সময় আমাদের জন্য দু'খানি মাসিক পত্র বেরুতো।—"সখা ও সাথী"—আর "মুকুল" এই দু'খানি মাসিক পত্র আমাদের সেই ইংরেজী কণ্টকিত মনে অপূর্ব্ব কল্পলোকের বাতাস ব'য়ে আন্‌তো।—সেটুকু দাস্, টমাস সাহেব, এরাই আমাদের মনকে শুধু যে বাঁচিয়ে রেখেছিল,—তা নয়, মনকে আশা দিত,—আশ্বাস দিত, মনে কল্পলোকের আভাস জাগাতো।—

থার্ড ক্লাসে পড়বার সময় আমাদের হেড্ পণ্ডিত ছিলেন,—শ্রীপতি কবিরত্ন—তিনি বই লিখতেন। বাংলা লেখার দিকে আমার অনুরাগ বুঝে—তিনি আমাকে দিলেন উপদেশ।—তাঁর কথায় কবিতা লিখা শুরু করলুম।—বাংলা দেশের হাওয়ার গুণে সব কিছুতে যেমন ছাতা ধরে, লোনা ধরে,—সেজন্য বিশেষ আয়োজনের ঘটা থাকে না, তেমনি এই বাংলা দেশের হাওয়ার গুণেই বোধ হয় এখানকার ছেলে মেয়েরা কবিতা লেখে। বোধ হয় এমন বাঙালী নেই, যিনি না ছেলে বেলায় দু'চার ছত্র কবিতা, লিখেছেন।—তার পর সেকেণ্ড ক্লাসে পড়বার সময়—পড়্‌লুম রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা,—রাজা রাণী নাটক এবং ছোটো গল্প! এ-পড়ায় আমার মন যেন বেলুনে ভর করে—ঊর্দ্ধ কল্পলোকের খানিকটা প্রত্যক্ষ করলুম। আমাদের নিত্যদিনের কথা নিয়ে এমন চমৎকার গল্প লেখা যায়!—আশ্চর্য্য,—রবীন্দ্রনাথের গল্প বার বার পড়তে লাগলুম। দিশাহারা মন যে আদর্শ খুঁজে অধীর হয়েছিল, সে আদর্শের সন্ধান মিললো!—

তার পর কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়্‌বার সময় একটা গল্প লিখ্‌লুম—হাসির গল্প, কিন্তু নিজের কাছেই সে গল্প লাগলো হাস্যকর! তার পর সেকেণ্ড ইয়ার—ভাগলপুরের তেজনারাণ জুবিলি কলেজ, কি কারণে

কলেজের হলো সকাল সকাল ছুটি, বাড়ী না গিয়ে কলেজ থেকে সোজা গেলুম সহপাঠি এবং বন্ধু "স্বেচ্ছাচারী" উপন্যাসের লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ ভট্টর বাড়ীতে। সেখানে তাঁর টেবিলে পেলুম মোটা একখানি খাতা—খাতায় কতকগুলি গল্প লেখা ছিল। গল্পগুলি লিখেছেন দেশ-গৌরব কথাশিল্পী ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখনো তিনি কথাশিল্পী খেতাব পান নি। কোনো লেখা তাঁর ছাপার অক্ষরে বেরোয় নি। বাইরের লোক তাঁকে চেনে না, জানে না—ব'সে তিনি নিজে মনের আনন্দে গল্প লিখছেন। সে খাতায় ছিল তাঁর লেখা—"বোঝা" "কাশীনাথ"—"অনুপমার প্রেম" "চিঠি" ব'লে গল্পগুলি!—ইংরেজী ১৯০১ সালের কথা বলছি। ও গল্পগুলির পর শরৎচন্দ্র লিখেছেন আরো গল্প—"কোয়েল" "পাষাণ" "চন্দ্রনাথ"!—গল্পগুলি পড়্‌লুম, প'ড়ে চমৎকৃত হলুম। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এমন গল্প লিখ্‌তে পারেন, এ ছিল আমার কল্পনাতীত! গল্পগুলি প'ড়ে কিশোর বয়সের আবেগ-উচ্ছ্বাসে করলুম সেগুলির সম্বন্ধে নানা আলোচনা। আলোচনা শুনে গম্ভীর কণ্ঠে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন ক'র্‌লেন—"তুমি গল্প লেখো?"—জবাব দিলুম—"না"—ব'ললেন—"কেন লেখো না?" গল্প কি বস্তু সে বোধ তোমার আছে। গল্প লেখবার চেষ্টা ক'রো!"—ব'ললুম—"ভাষায় বাধে, ষ্টাইল হয় না!—তার উপর প্লট্‌। শরৎচন্দ্র ব'লেছিলেন—"যারা কবিতা লেখে, তাদের হাতে ভাষা বাধে না—আর প্লট্‌? মানুষকে ভালো ক'রে দেখ্‌তে শেখো, দেখে ভাব্‌বার চেষ্টা করো, প্লট্‌ পেয়ে যাবে।" তাঁর এ-কথায় মনে যেন বিদ্যুতের চমক লাগ্‌লো। যাকে বলে—Electrify করা,—অমার মনকে তেম্‌নি তিনি Electrify ক'র্‌লেন। তাঁর কথায় মনের মধ্যকার ভয় সংশয়ের প্রাচীরগুলো ভেঙে গেল,—যেন মনে শক্তি পেলুম। মনে মনে পণ করলুম—"লিখ্‌বো—লিখ্‌বো—আমি গল্প লিখ্‌বো।" শরৎচন্দ্র যখন ভরসা দিচ্ছেন, তখন ভয়ে সংশয়ে দ্বিধার ভারে নিশ্চেষ্ট থাক্‌বো না।—

সেই বছরই ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা চুকিয়ে ভবানীপুরে এলুম। ভবানী-পুরে আমাদের ছিল "ছাত্র-সমিতি।" মাসে দুবার ক'রে সমিতির

অধিবেশন হ'তো।—সে অধিবেশনে প্রবন্ধ লিখে সকলে পালা ক'রে পড়্তুম। আমি এসে প্রতিমাসে হাতে লিখে "তরণী" ব'লে একখানি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলুম।—সকলের লেখা সংগ্রহ ক'রে আমিই স্বহস্তে পত্রিকা লিখ্তে লেগে গেলুম। সমস্যা হলো গল্প নিয়ে—গল্প না থাকলে মাসিক পত্রের মর্য্যাদা থাকবে না। গল্প কে লিখ্বে? আমার উপরেই গল্প লেখার ভার পড়্লো। দু' তিনটি গল্প লিখ্লুম। সে গল্প প'ড়ে বয়োবৃদ্ধেরা হাস্লেন, বললেন—"জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো আগে। সে অভিজ্ঞতা না জন্মালে গল্প হবে না।" একটা গল্প লিখেছিলুম—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া নিয়ে, দারুণ ট্রাজেডির। বিজ্ঞজনেরা সদুপদেশ দিলেন,—ব'ললেন—"স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া এমনতরো হয় না!" দমে গেলুম—ভাবলুম,—৪০।৪৫ বছর বয়স না হ'লে লেখার আশা নেই।—"তরণী" মাসিক-পত্রও কলেজের পড়ার চাপে দু' তিন মাস পরে বন্ধ রাখ্তে হলো, কিন্তু শীতকালে ঘট্লো সুরাহা—ইংরেজী ১৯০২ সাল।

কুন্তলীনের সৃষ্টিকর্ত্তা ৺হেমেন্দ্র মোহন বসু—H. Bose.—ব'লেই যিনি ছিলেন প্রখ্যাত, প্রতি বছর কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় গল্প চাইতেন। ভালো গল্পের জন্য মর্য্যাদানুসারে ৩০৲ টাকা থেকে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দিতেন। সর্ত্ত ছিল রসহানি না ক'রে গল্পের মধ্যে "কুন্তলীন" "দেল্-খোশের" নাম উল্লেখ করা চাই। তবে এ নাম গুঁজতে হবে সুকৌশলে। যাতে গল্পগুলি কোন মতে "কুন্তলীন" "দেল-খোসের" বিজ্ঞাপন ব'লে কেউ ভুল না করেন। এই সময় অমাদের এক বন্ধুর হলো বিবাহ—এবং কিশোর বয়সের স্বপ্ন সুষমায় মণ্ডিত তাঁর চিরবাঞ্ছিত ফুলশয্যার রাত্রি কি ব্যর্থতার মধ্যে কেটেছিল, তারি গল্প সখেদে বন্ধুবর আমাদের শুনিয়েছিলেন,—ফুলশয্যার পরের দিন! তাঁর সেই ব্যর্থ রজনীর কাহিনী অবলম্বন ক'রে চুপি চুপি আমি গল্প লিখলুম—"বৌদির কাণ্ড"। 'ক্যারারা হোয়াইট্' কাগজে মুক্তার হরফে কাপি ক'রে সেই গল্পটি কাকেও না জানিয়ে "কুন্তলীন" অফিসে দিয়ে এলুম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, সদ্য ফোর্থ ইয়ার সুরু ক'রেছি, "কুন্তলীন" অফিস্ থেকে

ডাকে সংবাদ এলো,—"বৌদির কাণ্ড" গল্পটির জন্য আমি পেয়েছি ৫৲ টাকা অতিরিক্ত পুরস্কার। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুরস্কার পাওয়া লেখকদের উপর অতিরিক্ত আরো কটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই অতিরিক্ত পুরস্কার একটি মিল্‌লো আমার ভাগ্যে। সাধনায় সাফল্য লাভ করায় সেদিনকার সে আনন্দ ইউনিভার্‌সিটির এগজামিন্‌ পাশ করার আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী হয়েছিল—একথা স্বীকার করছি।—কোর্থ ইয়ারে আবার হাতে লিখে তরণী বা'র ক'র্‌তে লাগলুম। গল্প লিখে "কুন্তলীনের" প্রাইজ পেয়েছি। অতএব আমাকে লিখ্‌তে হবে তরণীর জন্য এবং এবার প্রচুর উৎসাহে শরৎচন্দ্রের বাণী স্মরণ ক'রে গল্প লেখা শুরু কর্‌লাম!—

লিখ্‌লুম "নীরা" গল্প। ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, বাড়ীতে অভিভাবকদের কাছে একটি প্রবীণ ভদ্রলোক আস্‌তেন,—সেতারে তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা, তখন প'ড়ে গেছেন—অভিভাবকদের কাছে ছিল তাঁর খুব খাতির! বাড়ীতে তাঁকে ভালো কোনো কিছু খেতে দিলে,—তিনি তা' খেতেন না,—বাড়ী নিয়ে যেতেন। বেদানা-আঙ্গুর,—কমলা লেবু······আমের সময়ে ভালো আম ; বল্‌তেন—পয়সার অভাবে নাতি নাত্‌নীদের এসব খাওয়াতে পারেন না। তাই নিজে না খেয়ে তাদের জন্য ওগুলি নিয়ে যান। তাঁকে মনে ক'রে "নীরা" গল্পের বৃদ্ধ নন্দ কিশোরকে এঁকেছিলুম। তারপর লিখেছিলুম—"পাষাণ" গল্প। পাড়ায় একজন প্রবীণ ভদ্রলোক বাস ক'রতেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের খুব জাঁক ছিল, ব'লতেন,—একালে বি-এ, এম-এ পাশ ক'রলেও ইংরেজী কেউ শেখে না,—ক'জন জানে ভালো ইংরেজী! ভদ্রলোকের ছিল বিবাহযোগ্যা একটি মেয়ে,—মেয়েটির রঙ ছিল মিশ্‌কালো,—কিন্তু লেখা-পড়ায় তাঁর খুব অনুরাগ!—ইংরেজী সংস্কৃত ভাষা বেশ ভালো রকম শিখেছিলেন। ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল,—কোনো ডেপুটি, মুন্সেফ বা ডাক্তার, প্রফেসার তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবেন। বল্‌তেন—শিক্ষিত সমাজে গায়ের রক্তের আদর হবে বেশী, বিদ্যার চেয়ে—কখনো না।—এই ভদ্রলোককে একখানা জাল চিঠি লিখে পাড়ার ক'জন লোক

জানিয়েছিলেন,—অমুক তারিখে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ একজন পাত্র আস্‌বেন তাঁর কন্যাকে পাত্রী দেখতে। সরল মনে এ চিঠি বিশ্বাস ক'রে ভদ্রলোক নির্দিষ্ট দিনে ঘর সাজিয়ে মেয়ে সাজিয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের প্রত্যাশায় ব'সেছিলেন প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত। তখন চক্রান্তকারীরা গিয়ে তাঁকে চিঠির মর্ম খুলে বলেন।—এ ব্যাপারে মেয়েটি দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাঁদের ব'লেছিলেন—"আপনাদের লজ্জা ক'র্‌ছে না? বাবা আপনাদের কী ক'রেছেন যে, বাবার মনে এভাবে আঘাত দিচ্ছেন?" "পাষাণ" গল্পটি এই ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে লিখেছিলুম।

তারপর ছ'মাস চ'লে "তরণী" আবার বন্ধ হলো এবং পর পর দু বছর অর্থাৎ বাংলা ১৩১০ এবং ১৩১১ সালে "তরণীব" পাতা থেকে যথাক্রমে "মুক্তি" এবং "শান্তি" এ দু'টি গল্প আমি পাঠালুম—কুন্তলীন প্রতি-যোগিতায়। ১৩১০ সালে 'মুক্তি' গল্প পেল দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫৲ টাকার এবং ১৩১১ সালে "শান্তি" গল্প গেল প্রথম পুরস্কার ৩০৲ টাকা। "শান্তি" গল্পটি "কুন্তলীন" পুরস্কারের সুদৃশ্য কেতাবে ছেপে বেরোবা মাত্র তখনকার দিনে প্রধান মাসিক পত্র ছিল 'সাহিত্য'—এই সাহিত্য মাসিক পত্রের বিচক্ষণ, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ৺সুরেশ সমাজপতি মহাশয় আমার গৃহে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রলেন,—আলাপ ক'রলেন এবং তাঁর 'সাহিত্য' কাগজের জন্য নিয়মিতভাবে গল্প দিতে ব'ললেন। আমি জানালুম,—আমার লেখা তিন চারটি গল্প "তরণীর" পৃষ্ঠায় এখনো মজুদ্‌ আছে। তিনি তখনি "তরণী" চেয়ে গল্পগুলি প'ড়লেন এবং গল্প গুলিকে প্রকাশ যোগ্য ব'লে সাহিত্যের জন্য নিলেন। এইভাবে আমার লেখা—"নারী" "মণিমালা" "হারাণো নিধি" "ভাগ্যচক্র" এই চারিটি গল্প সাহিত্য পত্রে ছাপা হ'য়ে বেরুলো। আমার গল্পের ভাণ্ডার খালি হ'যে গেল।—লেখাও বন্ধ। তবু সমাজপতি মহাশয়ের তাগিদ চ'ল্‌লো সমানে। ব'ললেন,—গল্প লেখো—গল্প লেখা ছেড়োনা। আমার গল্প লেখার সম্বন্ধে আশার যে সম্ভাবনা আমার মনে তিনি সেদিন জাগিয়ে তুল্‌লেন,—সে আশ্বাসে পঙ্গু হয়তো গিরি লঙ্ঘনে উদ্যত হতো,—তাঁর সে কথায় আমি আবার গল্প লিখ্‌লুম। সে গল্পের নাম "ডায়েরির পাতা।"

এবং সেই থেকে কথাসাহিত্য সাধনায় আমি আমার জীবন-মন উৎসর্গ করলুম!—

"সাহিত্যে" আমার এই লেখাগুলি ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গে—তখন যাঁরা ছিলেন বাংলা সাহিত্য যুগন্ধর—রবীন্দ্রনাথ, ৺ স্বর্ণকুমারী দেবী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী—এঁদের স্নেহ সংস্পর্শ—লাভের সৌভাগ্য ঘট্‌লো। রবীন্দ্রনাথ অনেক উপদেশ দিতেন। উপন্যাস লেখার কথা উঠ্‌লে রবীন্দ্রনাথ ব'লতেন—ভালো দু'একখানি বিদেশী উপন্যাস আগে তর্জ্জমা করো। লাইন ধ'রে তর্জ্জমা নয়, নিজস্ব ভঙ্গীতে মর্ম্মানুবাদ। ব'লেছিলেন, তা' ক'রলে উপন্যাস লিখ্‌বার টেকনিক বুঝ্‌বো আর বুঝ্‌বো বক্তব্য বিষয় এবং নায়ক নায়িকাকে ফুটিয়ে তুল্‌তে অন্য পাত্র পাত্রীকে কতখানি এনে বর্জ্জন করা দরকার প্রভৃতি। সে উপদেশ মেনে ভিক্টর হুগোর একখানি এবং দোদের লেখা দু'খানি উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ ক'রেছিলুম। সে তিনখানি অনুবাদ উপন্যাস—"বন্দী" " " এবং "নবাব" নামে ৺স্বর্ণকুমারী দেবীর "ভারতীতে" ছাপা হ'য়েছিল। এ তিনে হাত মক্সো করার পর প্রথম মৌলিক উপন্যাস লিখি "কাজরী"। কাজরী বই হ'য়ে বেরোবার আগে আমার অন্য উপন্যাস প্রকাশিত হ'লেও "কাজরী" ই আমার হাতের প্রথম উপন্যাস।

আজ আপনাদের সামনে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে মনে কত কথাই যে জেগেছে—কিন্তু সময় সংক্ষেপ, তা ছাড়া অনেকক্ষণ নিজের কথা ব'লেছি। আপনাদের ধৈর্য্যের সীমা আছে, তাই শুধু আর একটি কথা না ব'লে বিদায় নিতে পারছি না। অন্ন সংস্থানের জন্য যে পেশা আমি গ্রহণ ক'রেছি,—সে পেশার কল্যাণে নরনারীর চরিত্রে এত বৈচিত্র্য দেখেছি যে, তার সীমা-পরিসীমা নেই। যা' আমি দেখেছি, যা শুনেছি, তারই উপর নির্ভর ক'রে লিখবার চেষ্টা ক'রছি। বিদেশী গল্প, নাটক, ইতিবৃত্ত, উপন্যাস প'ড়ে পাশাপাশি এদেশী বহু চরিত্রের যে ছবি আমার মনের পটে জেগেছে, সে ছবিও অক্ষম হাতে এঁকে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি। লিখে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তার স্পর্শে

কোনো বেদনা-ব্যথা, ক্ষোভ বা অভাব-অভিযোগ আমাকে অভিভূত ক'রতে পারেনি'—এবং যদি জান্‌তে পারি. যে আমার লেখা কোনো গল্প বা উপন্যাস প'ড়ে আপনারা নিমেষের জন্য এতটুকু আনন্দ পেয়েছেন, তা' হ'লে আমার সাধনা সফল এবং জীবন ধন্য মনে ক'র্‌বো। লেখায় আমার সহস্র দোষ ত্রুটি, অক্ষমতা এবং প্রগলভতার প্রকাশ রয়েছে—তার জন্য আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় আপনাদের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে আমার অন্তরের নমস্কার নিবেদন কর্‌ছি।—

প্রবোধকুমার সান্যাল

২৮শে এপ্রিল ১৯৪৫

এতকাল পরে যদি কেউ হঠাৎ প্রশ্ন করে কেমন ক'রে তুমি লেখক হ'য়ে উঠলে—তবে এক নিশ্বাসে জবাব দেওয়া কঠিন। যারা লেখে তারাই লেখক, সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই বিচার কেউ মেনে নেয় না। এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁদের লেখার অনেক দাম, যাঁদের লেখায় অনেক জ্ঞান-বুদ্ধির কথা, কিন্তু রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা ক'ল্কে পান না। আবার অল্প এমন লেখক আছেন, যাঁরা কথায় কথায় রসের শিল্প তৈরী করেন, এবং উঁচুদরের পণ্ডিতদের চেয়ে তাঁদের যশ অনেক বেশী। সত্যকার লেখক যারা, তারা বুঝ্তে পারে,—না লিখে তাদের উপায় নেই, না লিখলে তাদের চ'ল্বে না,—লিখতে পারলে তবে তারা সুস্থ বোধ করে। কালি, কলম, কাগজ না পেলে তারা নখের আঁচড়ে লিখ্বে দেয়ালে কিম্বা নিজের শরীরের মাংসের ওপর। লিখ্‌লে তবে তা'দের মুক্তি।

আমি হিজি বিজি লিখতে ভালো বাস্‌তুম। আমার ইস্কুলের খাতা ভ'রে উঠতো; কলম ভোঁতা হ'য়ে যেতো। ওই হিজিবিজির মধ্যে এক একটা কঠিন চমক লাগানো কথা এসে যেতো—ওটা যে আমার কথা এতে বিস্ময় বোধ করতুম। তারপর ভালো কথাগুলো বেছে সাজিয়ে পাতায় টুকে রাখতুম। অনেকদিন পরে খাতা পত্র নাড়া চাড়া ক'র্‌তে গিয়ে, সেই রচনা যখন চোখে পড়্‌তো—তার থেকে যেন আরো কিছু আবিষ্কার করতুম। লেখক হ'য়ে উঠ্‌বো একথা আমি কোনো কালে

কল্পনাও করিনি ; ছাপার অক্ষরে আমার নাম বাহির হবে, একথা স্বপ্নের অতীত ছিল। ছাপার অক্ষরে যাদের নাম দেখ্‌তুম, মনে হ'তো তারা যেন অপর কোনো গ্রহলোকের জীব, তারা এ-জগতের নয়। আমাদের ইস্কুল-বয়সে পাঠ্য বই কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়ার হুকুমও যেমন ছিল না,—বাইরের বই-পত্রের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। এসব নিয়ে চর্চ্চাও শুনতুম না।

ইস্কুলে আমাদের ক্লাসে বাংলা মাষ্টারের কৃপায় একবার একখানা হাতে লেখা মাসিক-পত্র আরম্ভ হলো। বইখানার নাম রাখা হলো—"বাণী"! মাষ্টার মশাই হুকুম ক'রলেন, প্রত্যেক ছাত্রকে কুড়ি লাইনের মধ্যে এক একটি রচনা করতে হবে,—আর তাতে সবচেয়ে দামী মনের কথা থাক্‌বে। মনের কথা সে বয়সে আমার কিছুই ছিল না, সুতরাং হিজি বিজি যা' খুশি তাই লিখে গেলাম। বেশ জানতুম লাঞ্ছনা আছে কপালে, কারণ মাষ্টার মশায় ছিলেন রগচটা লোক। কিন্তু আশ্চর্য, পরের মাসে আমাকে ওই হাতে লেখা মাসিকের সম্পাদক করা হলো। কেন না, সবচেয়ে ভালো লেখার পুরস্কার ছিল ওই সম্পাদকের গদিটা। লেখা পড়ার জন্য পুরস্কার আমি কোনো কালেই বিশেষ কিছু পাই নি, সুতরাং ঐ গদির অধিকার পেয়ে কী উত্তেজনা আমার,—তিন দিন ধরে কাঁপুনি আর থামে না। বলা বাহুল্য,—আমার সেই লেখাটায় কোনো পুটুতাই ছিল না, আজ দুঃখ হয় সেই মাষ্টার মশাইটির জন্য।—

পণ্ডিত মশাই আমাদের ক্লাসে সংস্কৃত পড়াতেন। আমাকে সংস্কৃত শেখানোর চেষ্টাকে আমি অত্যাচার বলে মনে করতুম।—অতএব ওই পণ্ডিত মশাইয়ের ওপর কোনো একটা পাল্টা অত্যাচার না ক'র্‌তে পার্‌লে আমার যেন আর কিছুতেই স্বস্তি হ'তো না, কৌশল ও হাতে ছিল অনেক।—পণ্ডিত মশাই ছিলেন বৃদ্ধ, কিন্তু স্বাস্থ্যবান এবং রাগী লোক। অথচ ভিতরে ভিতরে ছিলেন কোমল এবং স্নেহশীল।—হঠাৎ যেদিন তিনি মারা গেলেন, বুঝ্‌তে পার্‌লুম ইস্কুলের সর্ব্বাপেক্ষা সদাশয় ব্যক্তিটি বিদায় নিলেন। তার জন্যে শোক-সভা হবে,—ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু লিখে পড়তে হবে—এই ফর্‌মাশ এলো। এতকাল পরে

প্রকাশ কর্‌তে লজ্জা পাই,—অমিত্রাক্ষর ছন্দে—আমি একটি কবিতা লিখে ফেললুম। শোক সভার আগের দিন—সারাদিন নাওয়া খাওয়া নেই—অন্ততঃ এক দিস্তে কাগজ খরচ ক'রে কবিতাটা লিখলুম। কোথায় শেষ হলো, কোথায় গিয়ে খেই হারালো সেকথা এখন আর মনে নেই। তবে প্রথম দু'চার ছত্র আজো মুখস্থ আছে—

"আজি কিরে বার্তা এক ইরম্মদ রূপে
সবার হৃদয় মথি হানিল মরমে।
কালের সাগরে তুলি কল্লোল উচ্ছ্বাস,
দেবতা বাঞ্ছিত ভূমি অমরার ধামে
পশেছে পুরুষ এক—"

অত লোক জন আর শিক্ষকদের সামনে কবিতাটা পড়তে গিয়ে আমি ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপেই অস্থির।—কিন্তু ওই কবিতাতেই কী খ্যাতি! বেশ মনে পড়ে সারা দিন অভিধান খুলে রেখে ইরম্মদ শব্দটা কী কষ্টেই আবিষ্কার করেছিলুম! ঘটনাটা পঁচিশ বছর আগেকার!—ওই বয়সটায় কবিতা লেখার বাতিক আমাকে কেমন ক'রে যেন পেয়ে ব'সেছিল। আমার দিদিমা রাম প্রসাদের গান ভালো বাসতেন। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে চেষ্টা ক'র্‌তে লাগলুম, রামপ্রসাদের মতন শ্যামা সঙ্গীত লিখতে। মনে মনে হয়ত বেশ একটি অভিভাব হয়েছে,—হয়ত' লিখতে বস্‌ছি—কিন্তু পদ্যের অক্ষর গোনা কিংবা মিল খুঁজে বার করা—ওইটেই ছিল আমার পক্ষে কষ্টকর!—মিল খুঁজতে গিয়ে সারাদিন হায়রাণ,—মনটা যেন হাহাকার কর্‌তে থাকে। অনেক সময় মিল নেই, ছন্দ নেই, শব্দ সংখ্যা ঠিক নেই,—আমি ঝর্ ঝর্ ক'রে সিঁড়ি ভেঙে লিখে যেতুম। সেটা না হোত গদ্য রচনা, না হতো কবিতা। আজকালকার মতো গদ্য কবিতা সেকালে থাক্‌লে আমি সাহস পেতুম বৈকি?—আমার সেই গদ্য-রচনার বদভ্যাস কেটে গেল—যখন থেকে রবি ঠাকুরের কবিতা পড়া আরম্ভ কর্‌লুম। ভাবলুম আর যাই হোক্, এই অপচেষ্টা আর কোনো দিন কর্‌বো না।—মনে মনে কামনা কর্‌লুম, রবি ঠাকুর ছাড়া আর যেন কেউ কবিতা না লেখে।

বেশ মনে পড়ছে সেটা অসহযোগ আন্দোলনের সময়। বাইরে নানা গণ্ডগোল, আমি মাঝে মাঝে চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকি। কোনো কিছু ভালো লাগে না, স্থতরাং কতকগুলো গল্পের বই এনে পড়তে থাকি। গল্প পড়তে গেলেই আমার মনে প্রশ্ন উঠতো,—এটা ওরকম না হ'য়ে এ রকম হলো কেন?—মেয়ে পুরুষ চরিত্রগুলোকে লেখকের হাতে পুতুল মনে হ'তো। লেখকের ইচ্ছা অনিচ্ছা খেয়াল খুশিতেই তারা যেন নড়া চড়া করে।—তারা নিজেরা যেন স্বাধীন নয়, রক্ত-মাংসে গড়া নয়। লেখক আনে, তাই তারা আসে; তারা নিজেরা হেঁটে আসে না। লেখকই তাদের হাসায়, কাঁদায়,—তাদের নিজেদের স্বকীয়তা নেই। সে সব গল্প পড়্তে অনেক সময় হয়ত' ভালো লাগ্তো, কিন্তু কেমন একটা অভাব বোধ করতুম্। ফলে লেখকরা তাঁদের গল্প যেখানে শেষ ক'র্তেন, আমার কল্পনা আরম্ভ হতো সেইখান থেকে। এম্নি ক'র্তে ক'র্তেই একদিন বুঝ্তে পারলুম আমার মনেও কিছু কথা আছে। চেয়ে দেখ্তুম আমাদের চারপাশে যে পৃথিবীটা বাস্তব চেহারা নিয়ে প্রখর দিনের আলোয় জেগে র'য়েছে,—ওই সব লেখকরা যেন সমস্তটা অস্বীকার ক'রে চাঁদের আলোর চশ্মা চোখে দিয়ে কাহিনীগুলো লিখে গেছে। আমার মন দিন দিন কেমন যেন প্রতিবাদ ক'রে উঠছিল!—আমি যেন একটা পথ খুঁজছিলুম। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কী ছাই ভস্ম লিখি, তাই জান্বার জন্যে বাড়ীর লোকের কী অসীম কৌতূহল্! মা একদিন প্রশ্ন ক'র্লেন, কাগজ কলম নিয়ে হিজি বিজি কী করিস্?—আমি ব'ল্লুম—একটা গল্প লিখ্ছি!—গল্প!—মা একেবারে ভয়েই অস্থির!—তাঁর ছেলে বুঝি এবার উচ্ছন্নে গেল! পরদিনই তিনি গেলেন আনন্দময়ী তলায়। ঠাকুরের দরজায় মাথা খুঁড়ে জানালেন;—ছেলের স্থবুদ্ধি দাও মা।

সকাল বেলা পাছে লিখ্তে বসি,—এজন্যে আমাকে নানা ফাই ফরমাসে ব্যস্ত রাখতে হতো। রাত্রে পাছে কাগজ-কলম নিয়ে বসি, এজন্য অনেক সময় বড় বৌদি ব'লতেন,—দুটো হারিকেনের চিম্নিই আজ ভেঙে গেছে, ভাই। প্রশ্ন করতুম—তা' হ'লে আমি

লিখ্‌বো কেমন ক'রে ?—তিনি ব'লতেন—যত লিখছ,—ততই ছিঁড়ছ, লিখে তবে লাভ কি ?—তা' বটে,—আমি চুপ করে যেতুম।

কিন্তু গল্প আমাকে লিখতেই হবে, নৈলে আমি যন্ত্রণা বোধ করি। সুতরাং অপরাহ্নের দিকে একটু রোদ কম্‌লে আমি চ'লে যেতুম নারকেল ডাঙ্গা পেরিয়ে শিয়ালদার রেল-পথের উপর। সেখানে একটি সাঁকোর শান্‌-বাঁধানো জায়গায় একা ব'সে লিখ্‌তুম, কিম্বা লেখার কথা ভাব্‌তুম। আমি আঁক্‌তুম উঁচুতে, মাঝে-মাঝে পাশ দিয়ে ট্রেন চ'লে যায়,—আর নীচের দিকে নিত্য দিনের পরিচিত লোক যাত্রা দেখা যেতো। সেই এক্‌লা নির্জ্জনে আমার কল্পনার জগতের ছেলে মেয়েরা যেন মানুষের শরীর নিয়ে আমাকে ঘিরে কথা ব'লে যেতো। সমস্তদিন ধ'রে যত লোক দেখ্‌তুম, যত চেহারা আর প্রকৃতি আমার জানা থাক্‌তো,—এখানকার নির্জ্জনে ব'সে তাদের ভেতরের আসল মানুষটাকে দেখ্‌তে পেতুম। ওদিকে আমি আবার গরীব গেরস্থ ঘরের ছেলে; উপার্জনের বয়সে এসে পৌঁছতে আর দেরী নেই,—সুতরাং সে কথাটাও মন থেকে তাড়াতে পারিনে। কিন্তু সব কিছু ভুলে কেবল গল্প লেখার কথাই ভাবতে ভালো লাগ্‌তো!

প্রায় লেখকেরা সাধারণতঃ গল্প অথবা কবিতা লিখ্‌তে গিয়ে প্রণয়-কাহিনী দিয়ে আরম্ভ করে। আমি কোনো প্রণয় কাহিনী ভাবতেই পার্‌তুম না।—আমার ভালো লাগতো ভাই, বোন, বন্ধু, আদর্শবাদী, স্বার্থত্যাগী,—এদের নিয়ে কল্পিত কাহিনী লিখে যেতে।—ওইতেই আমি আনন্দ পেতুম। গল্প লেখার জন্যেই গল্প লেখা—এই চল্‌তি বুলি আমার ভালো লাগ্‌তো না।—যে গল্পটা শুধু নিছক একটা গল্পই হ'লো, তার থেকে আর কিছু পাওয়া গেল না—তেমন গল্প ছিল আমার দু'চোখের বিষ। একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা, একটা কোন দুরূহ ভাবনার পথ—এ যদি সব গল্পের মধ্যে না থাকে, তবে গল্প লিখে লাভ কি ?

আর একটা কথা ওই সময় আমার মধ্যে ছিল। আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখ্‌তে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে,

রাজমিস্ত্রি, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে—এই সব চরিত্র নিয়ে, কারণ তাদের জীবন-যাত্রাটা চোখে দেখ্‌তে পেতুম।—তাদের নিয়ে গল্পের ইন্দ্রজাল সহজেই বুনতে পারতুম। কোথাও অনাচার ঘটলো, কেউ বিনা দোষে মার খেলো, কেউ অহেতুক অপমানে নুয়ে' পড়লো—অমনি আমার গল্পলেখা সুরু। নিছক আর্টের আনন্দ বিতরণ ক'র্‌বো, ফুল, চাঁদ, লতা মৌমাছি আর বিরহ-মিলন নিয়ে কাহিনী ফাঁদ্‌বো,—এ আমি কোনো কালেই ভাব্‌তে পারি নি'। আমি ভাব্‌তুম মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তের ধারা যে লেখায় ছোটেনি, তাকে কিছুতেই সাহিত্য সৃষ্টি বলা চ'ল্‌বে না। আমি সে জন্যে পথে ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি—ষ্টিমার ঘাটে; চটকলের ধারে, রেল ষ্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলে ওয়েটিংরুমে তীর্থ-পথের মেলায়—আমি গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতুম। এক আধজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এক আধটা কাঁচা হাতের গল্প কখনো কখনো শুনিয়েছি, কিন্তু তারা বল্‌তো, ও সব ছোট লোকের কথা লিখো না, লোকে নিন্দে ক'র্‌বে। তাদের কথা শুনে ভয়ে ভয়ে আমি সে সব লেখা ছিঁড়ে ফেল্‌তুম। মনের জোর ছিল কম, ইচ্ছার জোর তার চেয়েও কম।

কোনো দিন কোনো লেখা নিয়ে আমি সম্পাদক অথবা প্রকাশকের কাছে যাই নি। ভয় ছিল পাছে কেউ মুখের উপর না বঁলে। সে অপমান কিছুতেই আমি সইতে পারবো না এই ছিল আমার বিশ্বাস।—ছাপা অক্ষরে নাম বার করার জন্য দৈন্য প্রকাশ করতে আমি মোটেই রাজী ছিলুম না। সেই জন্যে গল্প লিখে ঘরেই জমিয়ে রেখে দিতুম। আর হয়ত মাস তিন চার পরে সেই গুলোতে আগুণ ধরিয়ে তার সাম্‌নে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তুম। যে সব মেয়ে পুরুষকে অত যত্নে, অত আগ্রহে বুকের রক্ত দিয়ে গ'ড়েছি,—তারা সবাই চোখের সাম্‌নে আগুণে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, সে দৃশ্য মন্দো লাগতো না।—মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রে আমার ঘরের সাম্‌নেকার ছাদে অসংখ্য কাহিনী দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে—আর আমি সেই শ্মশানের রাঙা আলোয় দেখে নিচ্ছি পাড়া পল্লির ঘর-বাড়ী, বস্তি প্রতিবেশীর নিঃসাড় নিশুতি ঘুম। এর ভেতর থেকে আমি একটা অর্থ খুঁজে পেতুম।

সম্পাদকের কাছে যাই নি বটে,—তবে তাদের নামে ডাকে লেখা পাঠাতুম। দুপুর বেলা সবাইকে লুকিয়ে পোষ্ট অফিসে গিয়ে বুক পোষ্টে লেখা পাঠাতুম।—লেখা অমনোনীত হ'লে ফেরত পাবার জন্যে ডাক টিকিট সঙ্গে দিতুম। তার পর দিন থেকে কী অধীর অসহ্য প্রতীক্ষা আমার! বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম পথের দিকে তাকিয়ে, কখন ডাক পিওন আস্‌বে। দু'দিন, তিন দিন চারদিন, সাতদিন—সময় আর আমার কাটে না। হয়ত ডাক পিওন এলো,—হয়ত আমার বাড়ীতে চিঠিও দিলো, কিন্তু আসল বস্তুর খোঁজ নেই। লেখাটা ছাপা হবে, এ আশা কর্‌তুম না,—কিন্তু লেখাটা ফেরৎ এলে যেন সকলের অগোচরে সেটা নিয়ে লুকিয়ে ফেল্‌তে পারি,—এইজন্যেই দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম। ঠিক তাই হ'তো, লেখা ফেরৎ আস্‌তো। আমি সেই অভিশপ্ত রচনার দিকে আর ফিরেও তাকাতুম না।—সে লেখা যথাসময়ে চিতার আগুনে উঠ্‌তো।—

ভাবতুম কোনো মতে আমার একটা লেখা ছাপা হ'লে আর আমাকে পায় কে?—আমার খ্যাতি ছড়াবে দেশ দেশান্তরে, জনসাধারণের মুখে মুখে আমার নাম, সকালে উঠে বড়লোকেরা চায়ের আসরে ব'সে আমার স্তুতিবাদ ক'রবে, কতলোক আমার খোঁজ নেবে,—কত মাল্য চন্দন জুটবে,—আর আমি বিজয়ী বীরের মতন নিরাসক্ত হাসিমুখে চুপ ক'রে থাক্‌বো। সুতরাং সেইটুকু বর্ণনা ক'রে আমি আমার কাহিনী শেষ করবো।—

লেখা পাঠাই আর ফেরত আসে। টিকিট দিলেও অনেক লেখা কোনও দিনই আর ফেরত আসে না। একদিন কিন্তু এক মজার ঘটনা ঘট্‌লো। ডাক পিওন এসে একখানি মাসিক পত্র আমার হাতে দিয়ে গেল। এই মাসিকের নাম কোনো দিন শুনিনি। এর সম্পাদকের নামও আমার জানা ছিল না! কিন্তু কাগজটি খুলে হঠাৎ দেখি, আমার নামে আমারই একটি গল্প ছাপা হ'য়েছে।—সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌লো উত্তেজনায়, কাঁপ্‌তে লাগলুম ঠক্ ঠক্ ক'রে! কোন দিন এ কাগজে লেখা পাঠাই নি,—অথচ কেমন ক'রে আমার গল্প ছাপা হলো? আমাকে গৌরব এনে দিল বটে, কিন্তু বোকা বানিয়ে দিল! মনে প'ড়ে

গেল,—আমার এক বন্ধুর কাছে গোটা তিন-চার লেখা বছর খানেক আগে তা'র বাড়ীর লোকদের পড়্‌তে দিয়েছিলুম, ও গুলোর কথা ভুলেও গিয়েছিলুম—এ-লেখা তাদেরই একটি। না'—ভুল নয়, মিথ্যে নয়, স্বপ্ন নয়—এ আমারই লেখা বটে!—কিন্তু কী কাঁচা লেখা,—কী বাজে গল্প। সে লেখা কেউ পড়েছে; কেউ ভালো বলেছে—এ খোঁজ আমি পাইনি! সে লেখা ডুবে তলিয়ে গেছে,—হারিয়ে গেছে,—সে কাগজের নামও ভুলে গেছি। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কয়েকটা লেখা বেরোলো, কিন্তু কোন খ্যাতিই হ'লো না, কেউ নাম ক'র্‌লে না,—ধীরে ধীরে বুঝ্‌তে পার্‌লুম ছাপা অক্ষরে নাম বেরোনো কী মিথ্যে! কী মূল্যহীন! তখন প্রশ্ন উঠে দাঁড়ালো,—কেন আমি লিখি?—এতদিন ধ'রে সেই প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে চ'লেছি!

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৫ই মে, ১৯৪৫

আমার লেখার ইতিহাসের একেবারে গোড়ার অধ্যায়টা বড়ই করুণ,—এই জন্যে যে আমার প্রথম গল্পটি মারা যায়। খুবই দুঃখের বিষয় নিশ্চয়, কিন্তু সেটি বেঁচে থাকলে ইতিহাসটি আরও করুণ হয়ে উঠত,—কেননা আমায় নিজেকে মারা পড়তে হোত।···আপনারা একটু থতমত খেয়ে গেছেন দেখছি। তাহলে কথাটা খুলে বলতে হোল—

বলতে গিয়েও দ্বিতীয় বিপদ—আপনারা মনে করবেন তেলের বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই, সে ভয় করতে হলে মুখ বন্ধ করতে হয়। তেলে-জলে কখনও মেশে না, কিন্তু তবুও একথা মানতেই হয় যে অন্তত একটি তেল আমাদের সাহিত্যরূপ জলের সঙ্গে নিতান্ত নিগূঢ় ভাবেই মিশে আছে। সেটি কুন্তলীন। একে বাদ দিলে যে শরৎচন্দ্রেরও খানিকটা বাদ দিতে হয় সে সংবাদটা অনেকের বোধ হয় জানা আছে।

ওঁরা তখন প্রত্যেক বছর ছোট গল্পের জন্যে পুরস্কার দিতেন। গল্প-গুলি বেশ ঝকঝকে তকতকে একখানি বইয়ের আকারে বেরুত ; দাম থাকত কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে বইখানার বেশ প্রচার ছিল। ঐ বইখানিতে একটু জায়গা পাবার লোভ প্রবল হয়ে উঠল। লোভের মূলগত-ব্যাপারটা কি, অর্থাৎ টাকার দিকে বেশি ঝোঁক ছিল কি যশের দিকে তা এখন ঠিক মনে পড়ছে না—অনেকদিনের কথা তো ? তখন বোধ হয় থার্ড ক্লাসে পড়ি,—তবে বেশি সম্ভব, যশ। ঐ একটা

সময়, যখন অপযশের ভয় থাকে না, চলে যশের ছবিটা। খুব স্পষ্ট হয়েই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এখন এক কলম লিখতে হলে সমঝে—বুঝে এগুতে হয়,—পাঠক আছেন, পাঠিকা আছেন, পাঠক যা চান, পাঠিকা তা'তে নাক সিঁটকান, আবার এক বয়সের পাঠক পাঠিকা যা পেলে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, অন্তবয়সের পাঠক পাঠিকার সামনে সেইটিই-এগিয়ে দিলে হাত-পা ছুঁড়ে অভিসম্পাত দেন। আবার সবার ওপরে আছেন সমালোচক।

অবশ্য এক শ্রেণীর সমালোচকের ভাবনা তখনও-যে না ছিল এমন নয়, অর্থাৎ যারা বাছাই করবে। তবে তাদের কাল্পনিক মূর্তি ছিল অন্যধরণের। হয়-গল্পটা নেবে, না হয় ফেরৎ দেবে, চুকে যায় তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ। যতটা মনে পড়ছে এখন—সেই কাল্পনিক মূর্তিকে এখনকার সমালোচনার পাশে দাঁড় করিয়ে যতটা বুঝতে পারছি,—তাতে তাদের তেমন ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হোত না নিশ্চয়। তারপর যদি একবার হাত গলে বেরিয়ে যেতে পারলাম তো আর পায় কে। এই ছিল মনের ভাবটা।

যাই হোক—টাকার লোভই হোক, বা যশের লোভই হোক অথবা সাহিত্যিক প্রেরণা বলে যে গালভরা কথাটা আজকাল শুনি, তাই হোক—কোমর বেঁধে লেগে গেলাম কুন্তলীন পুরস্কার পেতে হবে। ব্যাপারটি খুব গোপনীয়। প্রথমত গল্পলেখা স্কুলের পড়া-করা নয়, দ্বিতীয়ত গল্পের মধ্যে নায়িকা বলে একটি মেয়েকে আমদানি করতে হয়, যিনি আমার নয়নের মনি হলেও বাবা কাকা প্রভৃতির যে চক্ষুশূল হবেন এ জ্ঞানটা টনটনেই ছিল। অবশ্য নায়িকা অর্থাৎ যাকে ভালবাসা চলে এইরকম বয়স আর শ্রী-ছাঁদের মেয়ে না হলেও যে গল্প হয় সেটা তখনও কিছু কিছু জানতুম, আর এখন ভালো রকমই জানি—এখন বোধ হয় আমার লেখায় বেশির ভাগ এড়িয়েই চলি এঁকে; কিন্তু তখন বয়স যে অন্যরকম! এঁরই অ্যাপীল ছিল সবচেয়ে বেশি।

এত বেশি ছিল যে, এই ধরণের একটি মেয়ে খাড়া করে, নিজেই নায়ক হয়ে দাঁড়ালাম,—তারপর চলল ভাঙাগড়া অর্থাৎ প্লটের মার-

প্যাঁচ। ব্যাপারটা সবিস্তারে আপনাদের কাছে বর্ণনা করতে পারব না। না পারবার কারণ—অনেকদিনের কথা, তার ওপর নিজেকে নায়ক করতে গিয়ে আমার মানসী নায়িকার সঙ্গে এমন আকণ্ঠ প্রেমে পড়ে গেলাম যে একটা ছোট গল্পের সাইজ হিসেবে ব্যাপারটা অতিরিক্ত জটিল হয়ে উঠল। খাতাটি বেশ মনে আছে এক্সারসাইজ বুক নয় (সবটা-তো চুরিরই ব্যাপার ?)—আন্দাজ তিন ইঞ্চি-বাই সাত ইঞ্চি একটা লম্বাটে বাঁধানো নোটবুক আকার প্রকারে অনেকটা অটোগ্রাফ খাতার মতো। হাসি অশ্রু, মান অভিমানে সেটা একেবারে উপচে পড়ল। আবার—একবার যা লিখেছি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি-নি, কেটেছি, নতুন করে লিখিছি ; দু'এক জায়গায় বোধ হয় আবার কেটে আবার নতুন করে লিখেছি,—নিজেই নায়ক, আবার নিজের হাতেই কলম বুঝতে পারেন—পূর্ণ স্বরাজ একেবারে—সে যা প্যাঁচান জিনিষ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাকে এতদিন পর্যন্ত স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখতে পারে এরকম উগ্র স্মার্ত এখন পর্যন্ত তো চোখে পড়ল না।

হাসিও পায় ; চমৎকার সময় এই সেকেণ্ড থার্ড-ক্লাসে পড়বার বয়সটা। গল্প যে শেষ করব,—একটা কিছু ঘটে নায়ক নায়িকা ক্ষান্ত হবে তবে তো ?—ধরুন যেমন—বিচ্ছেদ হয়ে গেল আর আশা নেই, বিবাহ হয়ে গেল আর দরকার নেই ; কিম্বা দুজনের মধ্যে একজন অথবা দুজনেই আত্মহত্যা করলে—আর বালাই-ই নেই।—লেখক নিজে নায়ক হওয়ায় এইরকম দাঁড়াল যে কয়েকবার বিচ্ছেদের পরও আশা আর গেল না, বিবাহের পরও রস জমবার জন্যেই কিছু খটকা রয়ে গেল, আর নায়ক নায়িকা পেলে অখণ্ড পরমায়ু,—ঠিক মনে পড়ছে না—হয় বিষ খেতেই চাইলে না, না হয় খেয়েও শিবের মতন নীলকণ্ঠ হয়ে বেঁচে রইল।

ফল এই হোল—যদি অন্য কাউকেও নায়ক করতাম তো গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ হোত ! এ নায়িকাকে একবার ছেড়ে আবার তখুনি ফিরিয়ে এনে—তাও বার বার এইরকম করে, গল্পটা যখন শেষ হোল

তখন তাকে ডাকে পাঠানোর শেষ দিন একেবারে শিয়রে এসে গেছে। এইবার একটু চাঁচা ছোলা করতে হবে, তারপর কপি করা। সমস্তটাই তো অভিভাবকদের দৃষ্টি-এড়িয়ে করতে হবে তার ওপর ছোট ভাইদের অপদৃষ্টি আছে, তারা যেন আঁচ পেয়েছে আমি ভেতরে ভেতরে কি একটা করছি,—বেয়াড়া রকম কৌতূহলী হয়ে উঠছে সবাই ; রীতিমতো নার্ভাস হয়ে উঠলাম। এদিকে পড়াতেও ক্ষতি হতে লাগল; স্কুলে বেঞ্চে দাঁড়ানোটা, নিদেনপক্ষে মাষ্টারের ধমক টিটকিরি খাওয়াটা একটি রোজকার ব্যাপার হয়ে পড়ল। ততদিনে শুধু ঐ কথাই ভেবে ভেবে আর লিখে লিখে নিজেকে এমন পাকা-পোক্ত ভাবে একজন নায়ক করে তুলেছি যে এই সব ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি অপমান বোধ করতে লাগলাম। চোদ্দ-পনোর বছরের একটি মেয়ে যার ভালোবাসায় মুগ্ধ যাকে পাবার জন্যে প্রাণপাত করতে বসেছে, সে ইংরেজরা কবে কর্ণাটিক দখল করেছিল, কিংবা একটা বিশেষ জায়গায় shall বসবে কি will বসবে বলতে না পারার জন্যে—ক্লাসের বেঞ্চে দাঁড়িয়ে সবার হাস্যাস্পদ হচ্ছে—এ কি ভাবতে পারা যায় ?

যাই হোক, এই সব বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে, আর একচোট নিয়ে পড়লাম গল্পটাকে। একটা উৎসাহও লেগে রইল,—তরী প্রায় ডাঙায় ভিড়িয়েছি তো ?

কিন্তু মাজা ঘষা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়তে হোল। শোনা ছিল ভালোবাসার দেবতা অন্ধ, এখন দেখলাম তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এমন সব কাণ্ড করে বসে আছি, যে সত্যিই যে চোখ চেয়ে দেখে তার সে রকম করবার কথা নয়। অন্ধভাবে শুধু উচ্ছ্বাস আর-হা-হুতাশের মধ্যে দিয়ে কলম চালিয়ে গেছি, সে যে কোথায় চলেছে একেবারে হুঁস করি-নি,—ফল এই দাঁড়িয়েছে যে সারা বাংলায় যাকে গল্প বলে তাতো হয়ইনি, অধিকন্তু পাতায় পাতায় অসঙ্গতি, আর এখন যে জিনিসটাকে গল্পের situation বা ঘটনা-সংস্থান বলে বুঝি, তার মধ্যে এত আশ্চর্যভাবে অসম্ভব কাণ্ড সব ঢুকিয়েছি যে নিজেকেই শিউরে-শিউরে উঠতে হোল। লেখার

ঝোঁকে,—অনুভূতির তীব্রতায় হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানশূন্য হয়ে-যা করেছি, এখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে ছেঁটেকেটে ফেলতে হোল। আপনাদের মধ্যে যাঁরা লেখেন তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে—লেখার চেয়ে লেখা বাদ দেওয়াটা কত শক্ত।—প্রথমত মায়া বলে একটা জিনিস আছে; কারুর কারুর ছটা আঙুল হয় ত দেখে থাকবেন,—একটা অসঙ্গতি তো? একিরে বাপু! আমাদের সময় থেকে পাঁচটাতেই তো সবার চলে যাচ্ছে—একি নতুন উপদ্রব! কিন্তু ছেটে ফেলতে পারে কি? পারে না সে তার কারণ শুধু অপারেশনের ভয় নয়, একটা মায়াও হয়—আহা শরীর থেকে বেরিয়ে একপ্রান্তে একটু আশ্রয় নিয়েছে, শরীরের রক্ত মাংস দিয়ে পুষ্ট করেছি, থাকই না—একটা ফালতু আঙুল বৈ তো কিছু নয়?···মনের থেকেও যা একটা ঝোঁকে বেরিয়েছে, দরদ দিয়ে যাকে এক সময় পুষ্ট করেছি তার সম্বন্ধেও অনেক সময়—এই রকমই একটা মায়া আসে—মনে হয় সে নিড়ানি দিয়ে গাছটা পুতেছিলাম, তাই যেন এখন গোড়ায়·বসাচ্ছি। এ একটা দিক, তা ভিন্ন লেখা কাটলে যে দাগটা হয়, সে দাগে নতুন লেখা মিলিয়ে বসানও বড় দুষ্কর হয়ে ওঠে। আর একবার গাছের তুলনা দিয়ে বলি—খুব পাকা মালী না হলে এই grafting অর্থাৎ কলম বাঁধায় সুবিধা করতে পারে না।

এটি আমার গল্পের গল্প, সুতরাং উপসংহার হিসেবে শেষে দু'টো কথা বললে মন্দ হয় না।

গল্পটা পাঠাতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটা দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার—না বেরুনটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভালো হয়েছে সব খতিয়ে দেখতে গেলে; কিন্তু তবু তো একটা নৈরাশ্যই? তার পাশে পাশে ভগবান বরাবরের জন্য একটি সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছেন—সেটা যে ঐ দেরি হওয়ার জন্যেই কর্তারা গল্পটা আর খুলে দেখেন নি নিশ্চয়। অর্থাৎ হলেও হতে পারতাম মস্ত বড় একটা কিছু এইটুকু রয়েই গেল।

আর একটা কথা,—কাল্পনিক হোক, তার যাই হোক—সেই যে উঠতি বয়সে একবার ক-ষে ভালোবেসে নিয়েছিলাম—আর জীবনে ওদিকে তাকাবার দরকারই হয় নি।

গল্পের কথার ফিরে আসা যাক। তালগোল যা পাকিয়ে গিয়েছিল, তাকে কেটে ছেঁটে সোজা করে আনা তো দুষ্কর হয়ে উঠলই, যদি বা কদিন গলদ ঘর্ম হয়ে একটা কিছু দাঁড় করান গেল তো তাকে সেই অজস্র কাটাকুটির হেঁটোয় কাটা ওপরে কাঁটা থেকে উদ্ধার করা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল।

এদিকে গল্প পাঠাবার শেষদিন ঘাড়ে এসে পড়ল।

এখন সেই থার্ডক্লাসের সাহিত্য যশলিপ্সু ছেলেটিকে অনেক পোড় খাওয়া সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে এই সব কথা বলছি; তখন তো তা ছিল না,—সব বাধা, সব নৈরাশ্য কাটিয়ে মনে হচ্ছে এইবার সাহিত্যিকের মুকুট উঠল এসে মাথায়। আর কটা দিনই বা? একদিন সবাই দেখবে অমুক স্কুলের অমুক ক্লাসের অমুক নামের ছাত্র গল্প লেখা নিয়ে পুরস্কার পেয়েছে—একেবারে পুরস্কার!—শুধু যে বইয়ে একটা গল্প বেরুল তা-ই নয়, সে তো রামা শ্যামা অনেকেরই বেরুচ্ছে। আশ্চর্যে সবাই হাঁ করে থাকবে।

সুখের বিষয় কাউকে হাঁ করতে হয় নি; দিনকতক পরে যখন নির্বাচিত গল্পের বই বেরুল, অমুক স্কুলের অমুক নামের ছেলেকেই উলটে হাঁ করে থাকতে হোল—তার গল্পের নাম গন্ধও নেই কোথাও।

সুখের বিষয় কেন বললাম?—গল্পটা বেরুলে যারা প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে হাঁ করে থাকতো তাদের পাশে একেবারে অন্যরকম অর্থাৎ রুদ্র দৃষ্টি নিয়ে যে বাবা-কাকাও এসে দাঁড়াতেন এটা একেবারে খেয়ালই হয় নি। বলা বাহুল্য নায়কের পার্ট করতে গিয়ে ক্লাসের পরীক্ষাটা বেজুত হয়ে গেল, ওঁরা দু'জনে যেন সন্দিগ্ধই হয়ে পড়েছিলেন যে আমি কদিন ধরে ভেতরে ভেতরে একটা কিছু মতলব নিয়ে রয়েছি। আমার হাড় কখানার সৌভাগ্য যে সে মতলব যে কত গভীর—আমি যে কী তলে তলে জল খাচ্ছিলাম সেটা আর জানবার সুযোগ হোল না ওঁদের।

আপনারা কি দুঃখিত হলেন যে আমার প্রথম গল্পটির কোন নিশানাই রইল না পৃথিবীতে? কিন্তু গল্পটি প্রকাশিত হলে আমারই যে কোন নিশানা রাখতেন না বাবা আর কাকা মিলে,—সেইটিই কি সুখের কথা হোত?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ই মে, ১৯৪৫

বাংলা তেরশ' পঁয়ত্রিশ সাল। কলেজে পড়ছি—বি. এস-সি। অনার্স নিয়েছি অঙ্কে। অঙ্কের মত এমন আর কি আছে? এত জটিলতায় এমন চুল চেরা নিয়ম! রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা তো অভিনব কাব্য—ছ্যাবলামি, নেকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।

ক্লাসে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, লেবরেটরীতে মসগুল হয়ে একস্‌পেরিমেণ্ট করি: নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়! হাজার নতুন প্রশ্নের ভাবে মন টলটল করে। ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড সব বিষয়ের মর্ম্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসাবে বিশেষ দাম না থাক, ছেলেমানুষেরও সেটা জানা থাক—যতক্ষণ সেটিকে তুলো ধূ'না করে না ঘাঁটছি, হজম কবা খাদ্যকে রক্তে মাংসে পবিণত করার মত পরিণত করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই। ক্লাশ এগিয়ে যায় বহুদূর, আমি মেতে থাকি দু'মাস আগে পডানো বিদ্যুতের এক অদ্ভুত ব্যবহার দিয়ে। স্বভাব আজও আমার যায় নি। একটু যা পডি আর একটু যা শুনি তাই নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার সময় যায়—রাশি রাশি পডা আব শোনার রীতিমাফিক পডাশোনা হয়ে ওঠে না।

জ্ঞান সমুদ্রের তীরে একটি উপলখণ্ড কুড়িয়েই গিলে ফেলে

আরেকটির দিকে হাত বাড়াতে পারি না—গেলার আগে পরে অনেক রকম প্রক্রিয়া করতে হয়। পাথর হজম করা তো সহজ নয়!

বিজ্ঞান প্রায় সুয়োরাণী হয়ে বসেছিল আমার উপর, শুধু আমার এই স্বভাবের জন্য আমাকে আয়ত্ত করে উঠতে পারল না। বৈজ্ঞানিকও হতে পারলাম না, পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়াও ঘটে উঠল না—জীবনটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হ'ল গল্প উপন্যাস লিখে!

তখন লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা ছিল না, বিজ্ঞানের প্রেমে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি। লিখতে শিখে লেখক হবার সাধ কবে জেগেছিল মনে নেই—বোধ হয় ছেলেবেলাতেই, লুকিয়ে লুকিয়ে যখন নিষিদ্ধ বই পড়তাম, তখন। বার তের বছর বয়সের মধ্যে বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্র-হীন পড়া হয়ে গেছে। আর সে কি পড়া! এরকম একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিনচার দিন মাঠে ঘাটে, গাছে গাছে, নৌকায় নৌকায়, হাট বাজার মেলায় ঘুরে আর হৈ চৈ মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম। বড় ঈর্ষা হত বই যাঁরা লেখেন তাঁদের ওপর। হয় তো সেই ঈর্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল একদিন লেখক হবার চেষ্টা করার সাধ।

লেখক হবার ইচ্ছা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হই নি। স্কুল জীবনের শেষের দিকে ইচ্ছাটা অল্পে অল্পে নিজের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা হাত মেলেছিল বহু দূরের ভবিষ্যতে—সঙ্গে সঙ্গে লেখবার তাগিদ যোগায় নি। অধিকাংশ স্কুল কলেজে হাতেলেখা মাসিকপত্র থাকে। সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা দশেক স্কুলে আর মফস্বল ও কলকাতার গোটা তিনেক কলেজে আমি পড়েছি। একদিন লেখক হব ভাবলেও এসব মাসিকে লেখা দেবার কথা ভাবতেও পারিনি। লিখব?—এই বয়স আমার, বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা কিছু আমার নেই, কোন ভরসায় আমি লিখব? লেখা তো ছিনিমিনি খেলা নয়! বাড়ীতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টাও আমি কখনো করিনি। আমার অধিকার নেই বলে।

১৩৩৫ সালেও, সে বছর আমি প্রথম লেখা লিখি, আমার এ মনোভাব বদলায় নি। বরং আরও স্পষ্ট একটা পরিকল্পনা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। বয়সের সীমা ঠিক করেছি। তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়—আমি সেই বয়সে লিখব। এর মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে হবে। সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়, নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্য চর্চ্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলব।

হ্যাঁ, তখন আমার বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, আজও বিশ্বাস করি না যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ আছে। তবে একথা সত্য যে কেউ একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক হতে চাইলে তাকে দিয়ে বিজ্ঞান বা সাহিত্য কোনটারই বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু একথাও সত্য যে, এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরাণো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সাহিত্য বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক হলে, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিংস্র মানুষের হাতে মারণাস্ত্রই তুলে দেবেন—তাঁর আবিস্কারকে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এযুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম্ম।

স্বীকার করছি, ১৩৩৫ সালে এসব তত্ত্বকথা মানতাম না—অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রেমের সঙ্গেই দৃঢতর হত লেখার সঙ্কল্প। কলেজ থেকে তখনকার বালিকা বালীগঞ্জে বাড়ীতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মত লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা অচেনা কোন একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চল্‌তি কাব্যরস উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসত নিজের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুচকে গেছে। ভেসে আসত ষ্টেসনে ও ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ আলোচনা। ভেসে আসত কলেজে সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্য-সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হত ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে

পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিত, তারা চোখ ঠারত আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মত, কোনদিন উঠত চাঁদ। আর ওই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষাভূষোর ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখের অনুভূতি হয়ে চ্যাচাত—ভাষা দাও—ভাষা দাও!

আমি কি জানি ভাষা দিতে?

একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য, নজরুল এদের নিয়ে সম্প্রতি হৈ চৈ পড়ে গেছে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে—সাহিত্যের দুর্গরক্ষী সিপাইরা কাঠের বন্দুক উঁচিয়ে দুমদাম চীনা ফটকা ফাটিয়ে লড়াই সুরু করেছে। আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল মাসিকপত্রের সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি প্রবণতা ও উদাশীনতায়।

নাম করা লেখক ছাড়া ওরা কেউ-লেখা ছাপায় না। দলের লেখক হলে ছাপায়—ব্যস্। অন্য কেউ পাত্তা পাবে না।

একজনের তিনটি লেখা মাসিকের আপিস থেকে ফেরত এসেছিল। সে সম্পাদকদের কুৎসিৎ একটা গাল দিল—কলেজের ছেলেরা যা দেয়, সম্পাদকদের না হোক অন্তদের আমিও যে ধরণের গাল গায়ের জ্বালায় কম বয়সে দিয়েছি।

তর্কে আমার চিরদিন বিতৃষ্ণা। অবিবেচক ছেলেটার অন্যায় মন্তব্যে বড় রাগ হল।

বললাম, 'কেন বাজে কথা বকছ? ভাল লেখা কি এত সস্তা যে, হাতে পেয়েও সম্পাদকেরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলিতো পড়ো, মাসে কটা ভাল গল্প বেরোয় দেখেছ? সম্পাদকেরা কি পাগল যে ভাল গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে গল্প ছাপবে? ভাল দূরে থাক, চলনসই একটা গল্প পেলে সম্পাদকেরা নিশ্চয় সাগ্রহে সেটা ছেপে দেয়।'

খানিক তর্কের পর প্রশ্ন হল: 'তুমি কি করে জানলে, প্রবোধ?'

প্রবোধ? প্রবোধ আবার কে? পুরাণো দিনের কথা বলার কি বিপদ! এখানে আবার বলে নিতে হবে যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল, অফিসিয়াল নাম ছিল শ্রীপ্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মাণিক

নামে তাকে ডাকত শুধু বাড়ীর লোক। ডাক নামের কাছে কি করে আসল নাম হার মানল পরে বলছি।

প্রশ্ন শুনে ভাবলাম, তাই তো! সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয়, সেটা তো প্রমাণ নয়! কোনদিন মাসিক বা মাসিকের সম্পাদকের ত্রিসীমানায় যাই নি—কি করে এদের বোঝাব যে সম্পাদকেরা ভাল গল্প পেলেই আদর করে ছাপেন—এমন কি চলনসই গল্প পর্য্যন্ত! বললাম, 'আমি জানি।' অনেক কথা কাটাকাটির পর বাজী রাখা হল। কি বাজী রাখা হয়েছিল বলবনা—আপনারা হয়তো ভাববেন কলেজে পড়বার সময় ছেলেগুলো এমন বখাটে হয়!

বাজী হল এই। আমি একটি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেব। যদি না পারি—সে কথা আর কেন?

আমি জানতাম পারব। কোনদিন এক লাইন লিখিনি, কিন্তু গল্প তো পড়েছি অজস্র। সাহিত্য হবেনা, সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সম্পাদক ভোলানো গল্প নিশ্চয় হবে। আমি কেন যে কেউ চেষ্টা করলেই এরকম গল্প লিখতে পারে।

ভাবতে লাগলাম কি নিয়ে গল্প লিখব। প্রেমের গল্প? হ্যাঁ প্রেমের গল্পই লিখতে হবে। বাংলা মাসিকের প্রায় সব গল্পই এক রকম প্রেম নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তাদের প্রেম হল, বিয়েতে বাধা পড়ল, বাধা কেটে মিলন হল, এই রকম গল্প একটা লিখব ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে? মন সায় দিল না। মন বলল, প্রেমের গল্প লিখতে চাও লেখো. কিন্তু পচা দুর্গন্ধ ছ্যাবলামির গল্প লিখো না—বাংলার ছেলেমেয়েগুলো যে গোল্লায় গেল এরকম গল্প পড়ে পড়ে।

আবার বলল মন, 'কেন, প্রেম কি তুমি দেখোনি সংসারে? এত মেলামেশা করলে মানুষের সঙ্গে? যে প্রেম বাস্তব জগতে দেখেছো—তাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে স্বপ্ন জগতের প্রেম করে দাও। তাও ভাল হবে ন্যাকামির চেয়ে।

তখন মনে পড়ল পূর্ব্ব বঙ্গের এক স্বামী স্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম। স্বামী বাঁশী বাজাতেন। বাঁশের বাঁশী নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হত—গিয়েও খুসী হলে বাজাতেন, নইলে বাজাতেন না। বাড়ীতে বাজাতেন—শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছর খানেক আমি শুনেছিলাম। বেশীক্ষণ বাজালে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ত।

এদের অবলম্বন করে এক ঘোরালো ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম অতসী মামী। ভাবলাম, এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, এই নিছক পাঠকের মন ভুলানো গল্প, এতে নিজের নাম দেব না। পরে যখন নিজের নামে ভাল লেখা লিখব, তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে, বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে, গল্পে নাম দিলাম ডাক নাম—মাণিক। কল্পনাশক্তি একটা ভাল ছদ্মনামও খুঁজে পেল না।

বাংলা মাসের মাঝামাঝি। বিচিত্রা অপিসে গিয়ে গল্পটা দিয়ে এলাম। কার হাতে জানেন? বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে। তিনি তখন বিচিত্রায় ছিলেন। আমি অবশ্য তখন চিন্‌তেও পারিনি—পরিচয় হয় পরে।

তারপর দিন গুণছি। বিশ্বাস ঠিক আছে, তবু ভাবছি কবে গল্পটা পিয়ন ফেরত দিয়ে যায়!

মাসের মাঝামাঝি গল্প দিয়েছি—পরের মাসের কাগজে অবশ্যই বার হবে না। তবু ভাবছি, বিচিত্রা বার হলেই দেখতে হবে।

একদিন সকালে ভাবছি, কলেজ যাব কি যাব না। একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলেন।

তিনি বিচিত্রার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য সম্পর্কে পরে শত মত বিরোধ সত্ত্বেও যিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমায় স্নেহ করেছেন, বন্ধু হয়ে থেকেছেন।

আমি অবশ্য চিনতাম না। নিজেই পরিচয় দিলেন। এবং আমার

অতসী মামী গল্পের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ নগদ টাকা হাতে তুলে দিয়ে দাবী জানালেন, আর একটি গল্প চাই।

তারপর সব ওলোটপালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলাম লেখা।

হঠাৎ একটা গল্প লিখে মাসিকে ছাপিয়ে কি কেউ লেখক হতে পারে? হাত মকস্ করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মকস্ করতে হয়। কেরাণীর বেশী খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত একটি ছোটখাট লেখকও লেখক হতে পারেন নি।

হঠাৎ কি কেউ লিখতে শেখে, না পারে? সাহিত্য সাধনার জিনিষ। এ সাধনার সূত্রপাত কি ভাবে হয় অনেক সাহিত্যিকের জীবনে তার চমকপ্রদ উদাহরণ আছে। আজ সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রথম লেখা' লিখবার কাহিনীতে তার একটি নমুনা পাবেন।

এখনো আত্মীয়স্বজন আপশোষ করেন, 'তোর দাদা লেখাপড়া শিখে দু'হাজার টাকার চাকরী করছে, তুই কি করলি বলত মাণিক?—না একটা বাড়ী, না একটা গাড়ী—'

আপনারা কি বলেন?

১৯শে মে, ১৯৪৫

আমি গদ্য-পদ্যের উভচর জীব। সাহিত্যের ইতিহাসে এইরকম উভচর যে-কজনের সন্ধান পাওয়া গেছে তাঁরা সকলেই প্রথম কথা বলেছেন গদ্যে, কিন্তু প্রথম রচনা লিখেছেন পদ্যে। আমার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ন' বছর বয়সে আমার প্রথম স্বাধীন রচনা পদ্যের আকারেই বেরিয়েছিলো—তাও মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজিতে। তারপর থেকে প্রায় রোজ একটি দুটি ক'রে পদ্য বানিয়ে মোটা মোটা খাতা ভরিয়ে ফেলতে লাগলুম—ইংরেজিতে আর নয়, সবই বাংলায়—এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেই ছোট্ট শহরে আমার কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু শুধু পদ্য লিখে বেশিদিন মন তৃপ্ত থাকলো না; আরো একটু বড়ো হ'য়ে হাতে-লেখা যে-সব মাসিকপত্র পরিচালনা করতে লাগলুম, তাতে পদ্যের পাশে পাশে আমার বহু গদ্য রচনাও বিকীর্ণ হ'তে লাগলো। এমন কি, বছর বারো যখন বয়স, তখন আমার একটি গল্পাকৃতি সুদীর্ঘ নিবন্ধ ছাপার অক্ষরেও প্রকাশ পেলো। পল্লী জীবনের মহিমা কীর্তন করেছিলুম তাতে, এবং সেটি ছাপা হয়েছিলো 'পল্লী-বাণী' নামে একটি কলকাতার মাসিকপত্রে—সে-পত্রিকা গত হয়েছে বহুদিন। তারপর বয়ঃসন্ধিকালে ছোটো শহর থেকে বড়ো শহরে এলুম—রচনার বেগ ও প্রাচুর্য দারুণ বেড়ে গেলো—কবিতা, গল্প' উপন্যাস, প্রবন্ধ হু-হু করে বেরোতে লাগলো। আরো দু' একটি গল্প ছাপার অক্ষরে দেখা দিলো—তারপর কলেজে ভর্তি হবার অল্প পরে হঠাৎ একদিন একটি ভালো কবিতা লিখে ফেললুম—ভালো এইজন্যে

বলছি যে এখনো আমার নিজের সেটি পাঠযোগ্য মনে হয়। সে কবিতার নাম 'শাপভ্রষ্ট', সেটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় বেরিয়েছিলো, এখন আছে 'বন্দীর বন্দনা'য়। এতদিনে আমার লেখার ছেলেমানুষ পর্যায় শেষ হয়ে তার বয়স্ক জীবন শুরু হ'লো। কবিতার বয়স্ক জনোচিত প্রশংসা করলেন কেউ-কেউ; নিজের মনেও আমি বুঝলুম যে কবিতা লেখাই আমার আসল কাজ। সেই সঙ্গে ছেলেবেলাকার ধারণাটা মনের মধ্যে থেকেই গিয়েছিলো যে আমি সব পারি, সব রকম লেখাই পারি, তাই বিবিধ গদ্য রচনায় বিরতি ঘটেনি কখনো। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত এ-কথা আমার মনেই হয়নি যে গল্প লেখায় আমি কখনো গভীরভাবে নিবিষ্ট হবো। কবিতায় আমি আত্মহারা হতুম, গল্প অনেকটা খেলার মতো ছিলো। হঠাৎ একদিন সে-খেলা মারাত্মক হ'য়ে উঠলো যখন 'কল্লোলে' আমার একটি গল্প বেরুলো, যার নাম 'রজনী হ'লো উতলা'। সে গল্প নিয়ে যে-উত্তেজনা উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো, আমার সমবয়সি অনেকের হয়তো তা মনে আছে। সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন মহিলারা—ঐ সতেরো বছর বয়সেই যে এ-সম্মান আমার ভাগ্যে জুটেছিলো এখন সে কথা ভাবতে ভালোই লাগে। একজন মহিলা বলেছিলেন, এ-ছেলেকে আঁতুড়ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলা হয়নি কেন। এ-যুক্তিতে দুর্বলতা ছিলো, কেননা আমি তো ভূমিষ্ঠ হ'য়েই গল্প লিখিনি বা, সে-রকম কোনো লক্ষণও প্রকাশ করিনি—তবু এই উক্তির সমর্থন অনেকেই করলেন। নবযৌবনে আদিরস একটু উগ্র হয়েই প্রকাশ পায়—ও-গল্পেও তা-ই হয়েছিলো, সেটা যে একটা অপরাধ এ-যুগে কারুরই তা মনে হবে না। ছেলেবয়সের একটা কাঁচা লেখা নিয়ে অতটা হৈ-চৈ বিজ্ঞজনেরা কেন করেছেন জানি না। যাই হোক, আমার পক্ষে তার ফল ভালোই হয়েছিলো। অল্প বয়সে সব জিনিসকেই মাদকদ্রব্যের মতো লাগে এমনকি নিন্দাকেও। এ-নিন্দায় দমে যাওয়া দূরে থাক, আমি অত্যন্ত বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এর পর থেকেই সত্যিকার মন দিলাম গল্প লেখায়। 'রজনী হ'লো উতলা' কোনো-কোনো মানুষকে

এমন উতলা না-করলে গল্প-লেখার দিকে আমি হয়তো বেশি দূর অগ্রসরই হতাম না।

এর বছর দুই পরে আমি নিজে ছাপানো পত্রিকা বের করলাম, তাতে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের সূত্রপাত হ'লো. স্বনামে বেনামে গল্পও উদ্গত হ'তে থাকলো মাসে-মাসে। এই সময়ে আমি প্রথম লিখে টাকা রোজগার করলুম বলা বাহুল্য সে-লেখা গল্পই। 'স্বদেশি বাজার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র বেরিয়েছিলো তখন, তাঁরা আমার একটি গল্প ছাপালেন, এবং মনি-অর্ডার যোগে আটটি টাকা পাঠালেন। সে টাকা যেদিন এলো আমি কুক্ষিদেশে বিস্ফোটকের উদ্গমে শয্যাশায়ী। আমার কোন লেখার মূল্য যে চকচকে আটটি রূপোর টাকা হ'তে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে রোমাঞ্চিত হলুম। এ-পর্যন্ত লেখনী দ্বারা—লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়—তবে কিছু কিছু অর্থ উপার্জন তো ক'রে আসছি, কিন্তু সেই আট টাকার মতো মিষ্টি আর কিছুই লাগলো না।

গল্প লেখার দিকে উৎসাহিত হবার আরো একটা কারণ হ'লো। লিখে টাকা পাব ভাবতে খুবই ভালো লাগলো আমার—আর তখনকার দিনে গল্পজাতীয় রচনা ছাড়া আর কোনো লেখার জন্য পারিশ্রমিকের কোনো কথাই উঠতো না। বলা বাহুল্য, টাকার ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে খুব বেশি সচেতন আমাকে তখনো হ'তে হয়নি, কিন্তু স্বোপার্জিত অর্থের মানসিক মূল্য তরুণ বয়সে অনেকখানি। যে-বয়সে অর্থোপার্জন করবার কথা নয়, সে বয়সে অর্থোপার্জনের একটা স্বতন্ত্র আনন্দ আছে। এর পরে দু'বছরের মধ্যে আমার অনেকগুলি গল্প সাময়িক। পত্রে বেরুলো, আর কলেজ ছাড়বার আগে যে-কখানা বই প্রকাশিত হ'লো তার মধ্যে দু'খানা ছোটোগল্পের।

বড়ো শহর থেকে মহানগরে এলুম। লেখনীচালনা ছাড়া জীবিকা উপার্জনের অন্য কোনো উপায় ছিলো না। গল্পের পর গল্প, উপন্যাসের পর উপন্যাস এত বেশি লিখতে লাগলুম যে লোকে একটু বিরক্তই হ'লো। তার সব লেখাই যে মনের আনন্দে লিখেছি তা নয়। জোর ক'রে

লিখেছি অনেক সময়, কষ্ট ক'রে লিখেছি। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, অত্যন্ত ক্লান্তিতেও লিখতে হয়েছে। প্রথম যৌবনে রচনার যে একটি সাবলীল দুর্বার গতি থাকে তা তখন স্বভাবের নিয়মে সংহত হয়েছে—তখন আমি পরিপূর্ণ আত্ম-সচেতন—লিখতে সময় লাগে, বেশি ভাবতে হয়, বেশি খাটতে হয়। এই আত্মসচেতনতাই সে সময়ে আমাকে বাঁচিয়েছিলো। সব সময় ভালো গল্প লিখতে না পারলেও সব সময় ভালো লেখা লেখবার দিকে আমার আত্মসচেতন মনের যে অধ্যবসায় ছিলো সেটা আমার একটা মস্ত শিক্ষা হয়েছে।

এইভাবে কাটলো তিন বছর। এ সময়টায় কবিতা আমি বলতে গেলে লিখিইনি—গল্প লিখে আর সময় ছিলো না। আমি দেখেছি এক-এক সময়ে এক-এক দিকে মনের একটা ঝোঁক আসে—কখনো কবিতার দিকে, কখনো গল্পের দিকে। যখনকার যে ঝোঁক তাকে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় দিতে পারলে ফল ভালোই হয়। একটি গল্প লিখলেই আর একটি গল্প লিখতে ইচ্ছে করে, একটি কবিতা লিখতে-লিখতেই আর চার পাঁচটি মনের মধ্যে মর্মরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু একান্ত নিবিষ্টতা প্রায়ই সম্ভব হয় না। কবিতা লিখতে-লিখতে গল্পে হাত দিতে হয় গল্পের নেশা ভেঙে দেয় রেডিওর বক্তৃতা লেখবার তাগিদ। এইভাবে কত লেখা যে হারিয়ে যায়, সবচেয়ে ভালো লেখাগুলো হয়তো লেখাই হয় না।

খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্প লেখক নই। আমার উদ্ভাবনীশক্তি দুর্বল; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে। এমন গল্প আমি কমই লিখেছি যার গল্পাংশ মুখে বলে দেয়া যায়। এমন গল্প কিছু কিছু লিখেছি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না। পাত্র-পাত্রীর আলাপে আলোচনায়, মনের অব্যক্ত চিন্তাধারায় অনেক পাতা ভরিয়েছি। অনেকে বলেন গল্পের মধ্যে সেটি অবৈধ। জানি না। গল্প লেখা সম্বন্ধে—কোনো কিছু লেখা সম্বন্ধেই—কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম দাঁড় করানো যায় না। একজনের হাতে যা ক্লান্তিকর, আর

একজনের হাতে তা-ই উপভোগ্য। তবে গল্পের আদর্শ সম্বন্ধে পূর্বে আমার যা ধারণা ছিলো এখন তা থেকে বদলেছে, হয়তো আরো বদলাবে। এ-বিষয়ে সন্দেহই নেই যে মনে মনে গল্পকে আমি কবিতার চাইতে নিচু আসনে বসাই—যাঁরা একই সঙ্গে কবিতা আর গল্প লেখেন তাঁদের পক্ষে ও-রকম না-হয়েই পারে না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, গল্প লিখতে আমার ভালো লাগে না। তা যদি না লাগতো তাহলে এতগুলি গল্প লেখা সম্ভব হতো না কিছুতেই। খুবই ভালো লাগে—কতগুলি মানুষকে সংসারে এনে তাদের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসার এমন একটা আনন্দ আছে যা একবার পেলে বার বার পেতে ইচ্ছা করে। তাই তো এখনো গল্প লিখছি, সম্ভবত আরো বহুদিন লিখবো।

কবিতা লিখেও যে গল্প লিখতে হয়, গল্প লিখেও প্রবন্ধ, তার কারণ এক-একটি কথা বিশেষ এক-একটি রূপের অপেক্ষা রাখে। কোনো কোনো কথা শুধু গল্প করেই বলা যায়। আর গদ্য গল্পের একটা মস্ত সুবিধে এই যে সেটা সাহিত্য তীর্থযাত্রার একটা হোল্ডল গোছের। তার মধ্যে নাটক, প্রবন্ধ, উপদেশ, বিদ্রূপ, সাময়িক টিপ্পনি—সবই কিছু কিছু মাত্রায় বেশ মানানসই করে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। এমনকি কবিতাও ঢোকানো যায়—কবিতা না হোক, কবিত্ব।

গল্প থেকে নাটক হয়, নাটক থেকে গল্প হয় না। গল্পের এই গুণের জন্ম গল্প লেখার সময় লেখকের মন ভারি একটা স্বাধীন স্ফূর্তির আস্বাদ পায়। যা খুশি তা-ই আসলে করা যায় না, অথচ ভাবখানা যেন তা-ই। এইটে আমার খুব ভালো লাগে। আমি দেখছি, গল্প করে লেখবার মতো অনেকগুলি কথা আমার মনে জমে উঠেছে, সেগুলি বলতে গিয়ে দেখি, আমার গল্পরচনার ধারা গেছে বদলে। গল্পের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে মেলাবার মাত্রা আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে হচ্ছে আমাকে। এই আবিষ্কারের পথ গল্প রূপের বিচিত্র বিভিন্ন আভাস এনে দিচ্ছে আমার মনে। এ-কথা ঠিক যে, দশটি গল্প লিখবার পর একাদশ গল্প লেখা মানুষের পক্ষে সহজ হয় না, একশো গল্প লিখে একশো এক নম্বরের গল্পও না। প্রতি গল্পই

নতুন সমস্যা নিয়ে আসে, তার সমাধানও নতুন না-হলে চলে না। পথে পথে পদে পদে নতুনের এমন অফুরন্ত উঁকিঝুঁকি যে কোনো লেখকই আর্কিমিডিসের মতো বলে উঠতে পারেন না—'পেয়েছি! হয়েছে!' আমার প্রথম গল্প লেখা এখনো হয়তো হয়ইনি। না কি লেখকের সব গল্পই তার প্রথম গল্প?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

২৬শে মে, ১৯৪৫

গল্প যে আমি কেন লিখলাম, কেমন করে লিখলাম, আমার লেখা গল্প জন-সাধারণের কেন যে ভাল লাগলো, কেন যে তাঁরা আমাকে এত খ্যাতি দিলেন, সম্মান দিলেন এ-সব কথা যখন ভাবি, তখন সত্যি সত্যিই আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। প্রথম জীবনে আমার বয়স যখন ছিল অপরিণত, যখন নেশার ঝোঁকে, অর্থ এবং খ্যাতির মোহে লেখার পর লেখা লিখে চলেছিলাম তখন আর এ-সব কথা ভাববার অবসর ছিল না। কিন্তু সব সময়েই কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অতৃপ্তি ছিল মনের মধ্যে। কেবলই মনে হতো কি ছাই ভস্ম লিখে চলেছি—কি হবে এ-সব লেখা লিখে।—পৃথিবীর জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভ নেই, তার চেয়ে লেখা বন্ধ করে দিই। কিন্তু লেখা আমি কিছুতেই বন্ধ করতে পারিনি, ক্রমাগত মনে হয়েছে এর চেয়ে ভাল লেখা লিখবো—আরও ভালো, আরও ভালো। ছোট ছেলে যেমন করে সোজা হয়ে হাঁটতে শেখবার আগে ক্রমাগত আছাড় খায়, তবু তার চলার চেষ্টা চলতে থাকে, আমারও হয়েছে ঠিক তেমনি। আজও আমি আছাড় খেয়ে খেয়ে চলেছি। স্খলন পতন, ত্রুটির অন্ত নেই, কত অক্ষম রচনা আমি আপনাদের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছি। এমন কত লেখা আমি আপনাদের দিয়েছি যা পড়ে আপনাদের মন পীড়িত হয়ে উঠেছে। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমার এই পরিণত বয়সে সে-সব কথা যখন ভাবি, তখন অনুতাপের গ্লানিতে মন আমার ভরে ওঠে। কারণ এখন আমি বুঝতে পেরেছি—মানুষের মনকে পীড়িত করবার অধিকার আমার নেই। আমরা কবি,

আমরা সাহিত্যিক,—আমরা জনসাধারণের সেবক। রস পরিবেশনই আমাদের ধর্ম্ম—এবং রসের মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দ ছাড়া আর-কিছু থাকতে পারে না। আমার রচনা দিয়ে ভুলেও যদি কোনদিন আপনাদের মনে আমি এতটুকু আঘাত দিয়ে থাকি, জানবেন তা আমি সজ্ঞানে দিইনি, আমার সেই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি যেন আপনাদের মনে আনন্দ পরিবেশন করে আপনাদের সেবা করে যেতে পারি।

আর এই কথা আপনারা স্থির জানবেন—আমি যা করেছি, নিজের ইচ্ছায় কিছু করিনি। আমি যে একজন গল্পলেখক হব, সেকথা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। বর্দ্ধমান জেলার যে-গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেখানে আমার বাল্যকাল কেটেছে, কৈশোর কেটেছে,—শহর থেকে দূরে—অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এমন একটি গ্রাম যেখানে না ছিল বড় ইস্কুল, না ছিল পোষ্টাপিস, না ছিল লাইব্রেরী, না ছিল-কিছু। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, অফুরন্ত আনন্দ, অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য এবং স্নেহপ্রবণ বহু বিচিত্র চরিত্র কতকগুলি নরনারীর আড়ম্বরহীন জীবন যাত্রা।

ছোট্ট, একটি মাইনর ইস্কুলের কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বাইরের বই বলতে দেখতে পেতাম—পি এম বাগচির পঞ্জিকা আর সারা গ্রামের মধ্যে চাঁদা করে কেনা একখানা রামায়ণ আর একখানি মহাভারত।

এমনি একটি গ্রামের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে বহুদিন পয্যন্ত বুঝতেই পারিনি যে, মানুষের জীবন নিয়ে গল্প লেখা চলতে পারে, সাহিত্য বলে মানুষের জীবনের একটি অতি প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ বস্তু আছে পৃথিবীতে।

গ্রামের বৈকুণ্ঠ মুখুজ্যে সুর করে রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারতেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দেখতাম—আমার মামার বাড়ীর দরদালানে পাড়ার মেয়েরা বস্‌তো সারি বেঁধে হাতদুটি জোড় করে, আর বৈকুণ্ঠ মুখুজ্যে প্রতিদিন গানের সুরে রামায়ণ পাঠ করতেন। সেই দিক দিয়ে কতবার পার হয়ে যেতাম, রামায়ণ পাঠের সুর কানে এসে বাজতো, অথচ শুনেও শুনতাম না। এখনও আমার বেশ মনে আছে—সেদিন

কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে বাইরে, ছুটতে ছুটতে এসে সেই দরদালানেরই এক কোণে নিতান্ত অপরাধীর মত আশ্রয় নিলাম। আমার দিদিমা বসেছিলেন এক পাশে, তাঁর ভয় হলো আমি যদি গোলমাল করি, পবিত্র রামায়ণ পাঠে বাধা পড়বে, আমার পাপ হবে তাই তিনি পূর্ব্বাহ্নেই চুপিচুপি আমাকে সাবধান করে দিলেন হাত জোড় করে চুপ করে বোসো, গোলমাল কোরো না।

চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় কি ! বাইরে তখন বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছে।

ওদিকে ভিখারীর বেশ ধরে রাবণ তখন এসে দাঁড়িয়েছেন সীতার পর্ণকুটীরের দুয়ারে ! রাম গেছেন স্বর্ণমৃগের সন্ধানে; সহসা রামের কাতর ক্রন্দন শুনে লক্ষণও চলে গেছেন। সীতা একাকিনী। রাবণ তাকে হরণ করে' পুষ্পক রথে চড়িয়ে উড়ে চলে গেলেন আকাশ পথে।

"বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম !
চক্ষু মুদি ভাবেন সেই দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥"

কতক্ষণ শুনেছিলাম ঠিক মনে নেই। কিন্তু এই তো মানুষের লেখা মানুষের গল্প। মনের মধ্যে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জাগলো যেমন করেই হোক, এই রামায়ণ বইখানি আমাকে আগাগোড়া পড়তে হবে।

কিন্তু বাধা অনেক। হলুদ-রাঙা কাপড় দিয়ে সযত্নে মুড়ে রামায়ণ ও মহাভারত বইখানিকে লক্ষ্মীর বেদীর ওপর তুলে রাখা হয়। বৈকুণ্ঠ মুখুজ্যে ছাড়া কারও অধিকার নেই এদের স্পর্শ করবার।

মুখুজ্যেকে একদিন ঘুষ দিলাম চার আনা পয়সা। নিতান্ত গরীব ব্রাহ্মণ। তার ওপর গলাটি ঠিক রাখবার জন্যে প্রায়ই দেখি তিনি গাঁজা খান। পয়সা পেয়ে খুসী হলেন। বললেন: জ্যৈষ্ঠমাসে আমার রামায়ণ পড়া শেষ হবে। বর্ষাকালে মহাভারত ধরবো। তখন আমি তোমাকে রামায়ণখানি দিতে পারি পনেরো দিনের জন্যে ! তবে একটি টাকা দিতে হবে।

তিনবার টাকা সংগ্রহ করলাম, তিনবারই খরচ হয়ে গেল। কারণ

মুখুজ্যের রামায়ণ শেষ হ'তে বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ়ও গেল। শ্রাবণ মাসের শেষে রামায়ণখানি হাতে পেলাম।

কি বিপুল আগ্রহে যে এই মহাকাব্যখানি আমি পড়েছিলাম, তা একমাত্র আমিই জানি।—সেই আমার প্রথম গল্প পড়া।

তারপর মাইনর ইস্কুলের পড়া শেষ করে' শহরে এলাম—হাই স্কুলে পড়বার জন্যে। এইখানে কবি নজরুল ইসলাম হলো আমার সহপাঠী।

আমি তখন নানারকম ছন্দে কবিতা লিখতে সুরু করে' দিয়েছি। নজরুলকে একদিন আমার একটি কবিতা শোনাতে গিয়ে দেখি—তার বালিসের তলা থেকে সে একটি খাতা বের করলে। তিনটি ছোট ছোট গল্প সে লিখেছে। দু'জনের ভাব হতে আর বেশি দেরি হলো না। নজরুল লেখে গল্প, আমি লিখি কবিতা। আমার কবিতা শোনে নজরুল, তার গল্প শুনি আমি।

কয়লা কুঠির দেশ। রবিবার দিন ছুটি পেলেই দু'জনে দুটি খাতা হাতে নিয়ে চলে যাই বহুদূরে। একদিন এক কয়লা খাদের পাশে সাঁওতালী কুলি-পাওড়ার কাছে আমরা বসে বসে গল্প করছি। আমার বেশ মনে আছে—দূরে প্রকাণ্ড চিম্‌নির মুখে ধোঁয়া উঠছে, চানকের মুখে হেড্‌গিয়ারের চাকা ঘুরছে, তার ওপর পড়ন্ত সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে, ঢং ঢং করে' ঘণ্টা বাজছে, মাটির নীচে থেকে কয়লা বোঝাই টবগাড়ী উঠছে, দূরে একটি আম-বাগানের পাশে হঠাৎ কোথায় যেন মাদল বেজে উঠলো। এই সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব ভাব জাগলো যে আমি আর কিছুতেই তাকে ভুলতে পারলাম না। বাড়ী ফিরে এসেই গল্প লিখতে বসে গেলাম। লিখলাম—'কয়লাকুঠি।' চারদিন লাগলো গল্পটি শেষ করতে। আমার গল্পের একমাত্র শ্রোতা নজরুল। তাকে গিয়ে শোনালাম। এই চারদিন সেও চুপ করে বসে ছিল না। সে লিখেছিল দুটি কবিতা। একটির নাম—'রাজার গড়' একটির নাম 'রাণীর গড়।' কবিতাটি এত ভাল লাগলো যে, লজ্জায় আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম।

দু'জনেই আমরা ভুল পথে চলেছিলাম। হঠাৎ এমনি করে'

আমাদের পথ খুঁজে পেলাম। এই দিন থেকেই আমি হলাম গল্প-লেখক, আর নজরুল হ'লো কবি।

তার পর থেকেই আমি গল্পের পর গল্প লিখে চলেছি। আমার গল্পের সর্ব্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি, এবং চরিত্রেরা সব সাঁওতাল কুলিমজুর। আজ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক্
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখীন মজদুরি।
এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার।
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
সাহিত্যের ঐক্যতান সঙ্গীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়
মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সুমুখে
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি
আমি বারম্বার তোমারে করিব নমস্কার।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯ই জুন, ১৯৪৫

কলেজ থেকে সবে বেরিয়ে একটি পল্লীগ্রামের হাই স্কুলে মাষ্টারি নিয়ে গিয়েছি। কলকাতার কাছে বেশ বড একটি গ্রামে। কাউকে চিনি না সেখানে। এক ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে থাকি, একাই থাকি। সারাদিন বাইরের ঘরে বসে আপন মনে ভাবি, এখন কি একটা ছুটি চলছে, স্কুল খোলে নি।

একদিন দেখি একটি ষোল সতেরো বছরের ছেলে একখানি বই হাতে সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমি ডাকলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তার হাতের বইখানি কি, তাই জানা। ছেলেটিকে বল্লাম— কি বই হে? সে বল্লে স্থরেন ভটচাযের বই। সে যুগে স্থরেন ভট্টাচার্য্যের বইয়ের বড আদব ছিল। লাইব্রেবী চলতো না স্থরেন ভট্টাচার্য্যের বই ছাডা। আমি বল্লাম—কোথায় পেলে বই? সে বল্লে—কাছেই রিপণ লাইব্রেবী। ওখান থেকে বই নিয়ে আসি। আমার মনে হোল, এ তো বেশ। এখানে লাইব্রেরী আছে, সে খবর কেউ দেয় নি। বই যদি পডতে পারি, নির্জ্জন বাসের দুঃখ অনেকটা ঘোচে। ছেলেটিকে সে কথা বলাতে সে তখনি রাজি হোল আমাকে লাইব্রেরী থেকে বই এনে দিতে।

সেই দিনটি থেকে ছেলেটি আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে রোজ যায়। ওই একটি মাত্র সঙ্গী আমার জুটেছিল সেই সঙ্গীহীন দিনগুলিতে। স্কুল থেকে ফিরে এসে তার উপস্থিতির অপেক্ষায় বসে থাকতাম। সে এলে

দুজনে গল্প করতাম, লাইব্রেরীতে বই আনতে যেতাম। ছেলেটির নাম পাঁচুগোপাল। সে একদিন আমায় বল্লে—জানেন আমাকে এখানে সকলে বালক কবি বলে? আমি বল্লাম—কেন? সে সগর্ব্বে বল্লে—আমি কবিতা লিখি যে! তা ছাপানও হয়েচে। আমাদের গ্রামে একখানা মাসিক পত্রিকা বার হয়েছিল একবার, তাতেই ছাপা হয়েছিল। বিকেলে ছেলেটি কাগজখানা নিয়েও এল, পল্লীযুবকদিগের উৎসাহে এবং তাদের নিরীহ অভিভাবকদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ ব্যয়ে 'বিশ্ব' নামক এই মাসিক পত্রিকাটি ছাপানো হয়েছিল—সেই প্রথম এবং সেই শেষ। সেই পত্রিকাটিতে পাঁচুগোপালের একটি কবিতা একেবারে গোড়ার দিকে ছাপানো হয়েচে, যতদূর সম্ভব মনে হচ্চে কবিতার নাম 'মানব'। পাঁচুগোপালের ওপর আমার শ্রদ্ধা হয়ে গেল, আমি নিজে তখন লিখি না বা কোনো দিন লেখক হওয়ার স্বপ্নও দেখি না। গোপনে দু' একবার কবিতা লিখবার চেষ্টা করেও দেখেছি মনের মত হয়নি বলে ছেড়ে দিয়েছি। বন্ধু বান্ধব বা পাড়া প্রতিবেশিদের বিবাহে ছন্দহীন কবিতা যে একেবারে না লিখেছি তা নয়। কিন্তু অত অল্প বয়সে নয়। পাঁচুগোপালকে সমীহ করে চলি, কারণ আমার চেয়ে তার হাত অনেক ভাল কবিতা রচনায়।

দুজনে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করি সন্ধ্যাবেলা। একদিন সে বল্লে—আসুন, আমরা এক টাকা দামের উপন্যাস বার করি। অনেক লাভ হবে। আমাদের গ্রামেই প্রেস আছে, অসুবিধে কিছু হবে না। আমি বল্লাম—তুমি লিখতে পারো কিন্তু আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। আমি কোনো দিন লিখিনি। পাঁচুগোপাল উৎসাহ দিয়ে বল্লে—ও আপনি খুব পারবেন, একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।

এমন সুরে বল্লে যেন উপন্যাস লেখাটা সাইকেল চড়তে শিখবার মত ব্যাপার, একটু অভ্যেস করলেই যে কেউ শিখে নিতে পারে। ওর কথার উত্তরে আমি কি বলেছিলাম না বলেছিলাম তা আজ মনে নেই, কিন্তু এর দুদিন পরে স্কুলে গিয়ে দেখি দেওয়ালে, ব্ল্যাকবোর্ডে, সামনের

নারকেল গাছের গায়ে সর্ব্বত্র ছাপানো কাগজ মারা, তাতে লেখা আছে :—

বাহির হইল ! বাহির হইল !! বাহির হইল !!!
এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
"চঞ্চলা" ।

স্কুলের ছেলেরা ও শিক্ষকেরা সবাই প্রশ্ন করতে লাগলো—এই যে মশাই, আপনি যে তলায় তলায় লেখক তা তো জানতাম না। 'চঞ্চলা' নামটি বেশ দিয়েছেন মশাই। তা একখানা বই দিন আমাদের। আমি তো অবাক। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না ; এ বইয়ের লেখক কে তাও জানি না। অথচ সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে !

বাড়ী ফিরে পাঁচুগোপালকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করলাম। এ কি ছেলে মানুষি বাপু ? নাগে একেবারে কাগজ ছাপিয়ে দেওয়া ! কে বলেছিল 'চঞ্চলা' নামক উপন্যাস আমি লিখবো ? 'চঞ্চলা' নামটিই বা পেলে কোথায় ? পাঁচুগোপাল কিছুমাত্র অপ্রতিভ হোল না। বিনীত হাস্যবিস্তার করে বল্লে—কেন, ওই তো বলেছিলেন, চেষ্টা করবেন। তাতে কি ? লিখুন না বই। খারাপ জিনিস তো কিছু ছাপিয়ে দিই নি আপনার নামে ?

ছেলেমানুষের কথার কি জবাবই বা দেবো। চুপ করেই থাকি। এদিকে যত দিন যায়, স্কুলের সহকর্মী শিক্ষক ও ছাত্রদলের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হয়ে উঠতে হয়। কবে আমার বই বের হচ্চে ? স্কুলের লাইব্রেরীতে যেন একখণ্ড উপহার দিই। এদের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে ভাবলুম, এক কাজ করা যাক না ? পাঁচুগোপালের বই ছাপা যা হবে, তা বুঝতেই পেরেচি। ও পয়সা পাবে কোথায় যে বই ছাপবে ? আমি একটা খাতায় পাতা কুড়ি বাইশ কিছু লিখে রাখি না ? যে দেখতে চায় তাকে দেখিয়ে বলবো, আমি তো বই লিখেচি। পাঁচুগোপাল বই না ছাপালে আমি কি করবো ? মান বাঁচানো নিয়ে বিষয়।

তাই করি। কখনো জীবনে গল্প লিখিনি, গ্রাম্য মাঠের ধারে রেল লাইন, তার ওপরে একটা সাঁকো, পেছনেই তলীবন। একটা মজা পুকুর। মজা পুকুর পাড়ে ষষ্ঠীতলা, পল্লীনারীরা পূজো দিতে আসে। স্কুলের ছুটির পরে রোজ রোজ সেই রেললাইনের সাঁকোর ওপর বসে গল্পের প্লট ভাবি, একটু একটু করে লিখি। এতদিন পরে এখনো সেই নির্জন পল্লীপ্রান্তর, সেই পুকুর পাড়ের ষষ্ঠীতলা, আকন্দ ফুলের কয়েকটি ঝাড় আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। যেখানে বসে বাণীদেবীর সাধনা করেছিলুম একদিন, প্রথম সাধনার সেই নির্জন আসনটি স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে আছে চিরদিন।

অতিকষ্টে গল্প লেখা শেষ করলাম। কিছুদিন গেল, একে ওকে পড়ে শোনাই। কেউ বলে ভালো হয়েছে, কেউ বলে মন্দ হয়নি। একদিন সখ হোল গল্পটা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোনো কাগজে ছাপে কিনা চেষ্টা করলে কেমন হয়? নিয়ে এলুম সেটা কলকাতায়, একটা বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার আফিসে গল্পটা দিয়েও এলাম। তাঁরা বল্লেন, ঠিকানাটি রেখে যান, মনোনীত না হোলে কিন্তু ফেরৎ পাঠানো হবে।

সে গ্রামে ফিরে ডাকপিয়নকে বলে দিলাম, যদি আমার নামে কোনো বুকপোষ্ট আসে, তবে স্কুলে বিলি করো না বাপু। আমাকে বোলো, ডাকঘর থেকে নেবো গিয়ে।

একদিন সত্যিই ডাকপিয়ন বল্লে, আপনার নামে একটা কি এসেছে, বুকপোষ্ট 'মত। আমি বল্লাম—ও সব কথা এখানে বোলো না, চলো ছুটির পরে ওখান থেকেই নেবো। মনে বড়ই দুঃখ হোল। এত চেষ্টা করে গল্পটা লিখলাম, ফেরৎ দিলে ওরা?

ডাকঘর থেকে বুকপোষ্টটা নিয়ে খুলে দেখি সেটা আমার গল্পই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের একখানা চিঠি। তাতে লেখা আছে, গল্পটি তাঁদের খুব ভাল লেগেছে, এ মাসেই তাঁরা ছাপতে চান, শেষের প্যারাতে একটু পরিবর্তন আবশ্যক, সেটা করে আমি যেন লেখাটা তাঁদের খুব শীঘ্র পাঠিয়ে দিই।

সেদিন সেই গ্রামে এমন একটি লোকও ছিল না, কোনো না কোনো

ছুতোয় সেই পত্রখানা যাকে পড়ে শোনাই নি। জীবনের সেই প্রথম সাফল্য বাণীসাধনার, প্রথম যৌবন দিনের সে অপূর্ব্ব উৎসাহ, বিপুল আনন্দের স্মৃতি আজও আমার মানসপটে অম্লান হয়ে আছে। সহকারী সম্পাদকের সামান্য একখানা চিঠি, সে যেন তখন আমার জীবনের পরম সম্পদ। পরবর্ত্তী জীবনে অনেক বড় লাভের ও প্রশংসার বাণীতেও আমি আর সে ধরণের আনন্দ আস্বাদ করিনি। ধরার অরুণোদয়ের মত আমার জীবনে সেইদিনটি পরম পবিত্র, পরম পুণ্যময়। অন্য লোকের কাছে কোনো মূল্য নেই হয়তো, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসে সেই সামান্য চিঠিখানি একটি অতি মূল্যবান দলিল।

আমার এই প্রথম ছোট গল্পটি হচ্ছে, 'উপেক্ষিতা' আমার 'মেঘ-মল্লার' নামক ছোট গল্পের বইয়ের শেষের দিকে আছে।

সরোজকুমার রায় চৌধুরী

২৩শে জুন, ১৯৪৫

এতকাল পরে প্রথম গল্প রচনার তারিখ স্মরণ করা সহজ নয়। এও অনেকটা শিশুর প্রথম কথা বলার তারিখের মতো। অনেক দিনের প্রয়াসের পর হঠাৎ একদিন শিশু একটা শব্দ উচ্চারণ করে। আরও কিছু দিন পরে একদিন সবিস্ময়ে দেখা যায় যে কথা বলছে। সমস্ত জিনিসটা এমন ধীরে ধীরে এবং প্রায় অজ্ঞাতস্বরে অগ্রসর হয় যে, তার তারিখ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব।

যতদূর মনে পড়ে, প্রথমে কবিতাতেই আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলাম এবং সেই ব্যর্থ প্রয়াস অনেক দিন ধ'রে চলেছিল।

এরই মধ্যে একদিন একটা গল্প লিখেছিলাম। ধরা যেতে পারে, গল্পরচনার সেইটেই প্রথম সম্পূর্ণ প্রয়াস। কারণ, আমার বিশ্বাস, এর আগে যদি কোন গল্পরচনা আরম্ভও ক'রে থাকি, সেটা শেষ করিনি। তার পূর্বেই ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তখন আমার বয়স কত হবে ? বারো-তেরোর বেশি নয়।

সমগ্র গল্পটি অনেক পরিশ্রমেও আজ আর স্মরণ করা সম্ভব নয়। সেই মহামূল্যবান সাহিত্য প্রচেষ্টার কোনো চিহ্নও আজ আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিংবা হয়তো আছে। যেখানে কিছুই হারায় না,—মানুষের সমস্ত হাসি, সমস্ত গান, সমস্ত চিন্তা যেখানে তোলা থাকে,—সেই মহাশূন্যের দপ্তরে হয়তো আছে। খুঁজে দেখতে পারো।

আমার এখন কেবল এইটুকু মনে পড়ছে, একটি রাখাল ছেলে আর রাজকন্যাকে নিয়ে গল্পটি লেখা হয়েছিল।

ছেলেটি গ্রামের প্রান্তে বুড়োবটের ঘনছায়ায় বসে বাঁশী বাজাতো। ঘরের কোণে শুয়ে-শুয়ে রাজকন্যা সেই বাঁশী শুনতো আর অধীর হয়ে উঠতো।

একদিন দুপুর বেলা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। সেই রোদে হিঙ্গুল নদীর জল যেন লাখো হীরার টুকরার মতো ঝকঝক করছে। গ্রামের সরু পথে জনমানবের চিহ্ন নেই। শুধু একটি গাভী দূরে ছায়ায় শুয়ে মুদিতনেত্রে অলসভাবে রোমন্থন করছে।

রাজবাড়ীর সব সুখ সুপ্ত। রাজকন্যা আর থাকতে পারল না।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়লো পথে। হিঙ্গুল নদীর ধারে ধারে সোজা চলে গেল সেই বুড়ো বটের নীচে।

রাখাল ছেলে একমনে বাজিয়ে চলেছে বাঁশী।

চারিদিক নিস্তব্ধ।

রাজকন্যা ধীরে ধীরে তার পাশে এসে বসলো। রাখাল টেরও পেলে না। সে কেবলই বাঁশীতে সুরের পর সুরের তরঙ্গ তোলে।

তারপরে ?

তারপরে নিশ্চয় ওদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

মোটামুটি এই ছিল গল্পটা। অত্যন্ত সহজ, সরল একটা ছোট-গল্প। কোনো প্যাঁচ ছিল না, জটিলতা ছিল না, মনস্তত্ত্বের অবতারণাও ছিল না।

এখন ভাবছি, গল্পটা আমার মাথায় কি করে এসেছিল ?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, গল্পটি সম্পূর্ণ মৌলিক বোধ হয় নয়।

পাড়াগাঁয়ের আবেষ্টনে রাখাল ছেলের কথা মনে পড়া আশ্চর্য নয়। বুড়োবটের নিচে বসে বাঁশী তারা বাজায়। কিন্তু রাজকন্যা তখন চোখেও দেখিনি। শুধু উপকথায় শুনেছি।

হয়তো অর্ধ-বিস্মৃত উপকথার সঙ্গে কিছু নিজের কল্পনা মিশিয়ে গল্পটা তৈরী হয়েছিল।

উপকথায় এমন গল্প অনেক আছে।—

রাজা রাত্রে প্রতিজ্ঞা করলেন, সকালে উঠে প্রথমে যারই মুখ দেখবেন, তারই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। মুখ দেখলেন, প্রথমে উঠেই মেথরের। প্রতিজ্ঞা তো রাখতেই হবে। সুতরাং মেথরের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। কোথাও বাধলো না। না সমাজে, না গল্পে।

উপকথার জীবন এমনি সরল, এমনি সহজ।

সুতরাং রাখাল ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার যদি বিয়ে দিয়েই থাকি, তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে? আজ হয়তো এ বিয়ে দিতে আমার বাধতো। সমাজের কথা ভাবতাম, রাজার মর্যাদার কথা ভাবতাম,— আরও অনেক কিছু ভাবতাম।

সেদিন ভাবিনি।

অলস মধ্যাহ্নে সুপ্তসুপ্ত রাজবাড়ির সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রাজকন্যার বাইরে চলে আসা যে সহজ নয়,—রাজার পাহারা যে বড় কড়া,—সে কথা সেদিন মনেই আসেনি। কোনো রাজকন্যার পক্ষে এমনি ক'রে বাইরে চলে আসা নীতিগ্রাহ্য কি না, সে কথাও ভাবিনি। রাখাল ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেওযা শোভন হবে কি না তাও ভাববার অবসর ছিল না।

রাখাল ছেলে বাঁশী বাজায় ভালো। নিস্তব্ধ দুপুরে গ্রামের বাইরে একলা বসে সে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে। রাজকন্যার চোখের ঘুম যায় উড়ে। চোখের সামনে থেকে সমস্ত সংসার যায় মুছে।

কল্পনায় আমিও সেই বাঁশী শুনে বোধ করি বা উতলা হয়ে উঠেছিলাম। আমার বোধ করি বা খুবই ভালো লেগেছিল। এবং সেই ভালো-লাগার প্রমাণ দেবার জন্যেই হয়তো বা রাজকন্যাকে সেই ভর্তি দুপুর রোদে রাজ-পুরীর বাইরে এনেছিলাম। মাঠ ভাঙিয়ে, করবী গাছের ঝোপ পেরিয়ে হিঙ্গুল নদীর ধার দিয়ে-দিয়ে রাখালের কাছে নিয়ে এসেছিলাম।

আসল কথা, রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল ছেলের বিয়ে দেওয়াটা আমার নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছিল। রাজকন্যার পক্ষে রাজপুরীর বাইরে আসা উচিত হবে কি না, সে সব ভাববার তখন আমার অবসর ছিল না।

যে রাখাল বাঁশী এত ভালো বাজায়, তার একটা বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার তৃপ্তি হত না। আর বিয়ে যদি দিতেই হয়, তাহ'লে রাজকন্যার চেয়ে সু-পাত্রী আর কোথায় পাওয়া যাবে?

নিয়ে এলাম রাজকন্যা। ফুলের মতো টুকটুকে। দুধে-আলতা রং। মেঘের মতো এক রাশ কালো চুল। হাসলে জ্যোৎস্না ফোটে, কাঁদলে ঝরে মুক্তো। ভালো যে বাঁশী বাজায়, হোক না সে রাখাল, রাজকন্যা ছাড়া আর কার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারি?

অতএব রাজপুরীর সদরে এবং অন্দরে স্ত্রী-পুরুষ যারা ছিল, সেই বিশেষ মধ্যাহ্নে তাদের সবাইকে ঘুমিয়ে পড়তে হ'ল। সাত-দেউড়ির সাতটি অর্গল অনর্গল গেল খুলে। মাঠের ব্যবধান ঘুচে গেল। ওদের দুজনের মিলন হ'ল।

তবে আমি বাঁচলাম।

সাহিত্যে একটা কথা আছে,—অনিবার্যতা। যার অর্থ ঘটনা প্রবাহ নিজের স্বাভাবিক গতিতে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে ছুটছে। আমার প্রথম গল্পটির কথা ভাবতে গিয়ে এখন আমার মনে প্রশ্ন উঠছে,—এই যে অনিবার্যতা, এর অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে কোথায়,—ঘটনার প্রবাহে, না লেখকের মনের মধ্যে?

ঠিক জানিনে। কিন্তু সেদিন, সেই বারো-তেরো বছরের কিশোর শিল্পী-মনের কাছে অনিবার্যতা ঠিক ঘটনা-প্রবাহের মধ্যেই একান্ত ক'রে সীমাবদ্ধ ছিল না। নিজের মানসিক চরিতার্থতার প্রয়োজনই তার কাছে সে দিন বড় হয়ে উঠেছিল। রাজপুরীর সেপাই-শান্ত্রী, ঢাল-তলোয়ার কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারনি।

কবিদেরও এতখানি নিরঙ্কুশ হওয়া ভালো কি মন্দ সে প্রশ্নের বিচার আপনারা করুন। কিন্তু ধরুন, গল্পটা যদি এই ভাবে লিখতাম—

রাজকন্যা এসে বসলো রাখালের পাশে। তার লাল শাড়ী বুড়ো বটের শিকড়ে ছড়িয়ে পড়ে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

বাঁশী বাজানো শেষ হলে রাখাল রাজকন্যার দিকে চাইলে। তার চোখে তখনও স্বপ্নের ঘোর।

তার কেমন মনে হ'ল, সুরে যাকে সে ধরতে পারছে না, যে কেবলি ডাক দেয় এবং পালিয়ে বেড়ায়, এতদিন পরে সেই কি এল ধরা দিতে"?

বললে, এত দিনে এলে ?

ওর বড় বড় চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে দু ফোঁটা জল পড়লো।

রাজকন্যা আঁচল দিয়ে সেই জল মুছিয়ে দিতে যাবে, এমন সময় রাজার একশো শান্ত্রী পাহারা যমদূতের মতো এসে উপস্থিত হ'ল।

তাদের এক দল চতুর্দোলায় চড়িয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে চলে গেল।

বেহারাদের মৃদু-গম্ভীর সুর বাতাসে মিলিয়ে যেতে-না যেতেই রাখাল ছেলের শির সেই নিস্তব্ধ বুড়ো বটের ছায়ায় লুটিয়ে পড়ল।

একটু আগে রাজকন্যার লাল শাড়ীর আঁচল যেখানে লুটিয়ে পড়েছিল, রাখালের রক্তে চকিতে সেখানটা রাঙা হয়ে উঠল !

সমাজ বাঁচিয়ে, নীতি বাঁচিয়ে গল্পটি যদি এই ভাবে শেষ করতাম, তা হ'লে কি ভালো হত ?

একটা অজ্ঞাত কুলশীল রাখালের ছেলে সমাজের জন্যে, নীতির জন্যে এবং এত বড় রাজার মর্যাদার জন্যে যদি মরেই, তাতে কার কি এসে-যায় ?

অন্ততঃ আমার তো কিছু এসে—যেত না। কিন্তু এই পরিণত বয়সেও আমার শিল্পী মন গল্পটির এই রকম পরিসমাপ্তিতে কিছুতে সায় দিতে পারছে না। রাখাল এবং রাজকন্যার গল্পে মিলন ছাড়া পথ নেই। জটিল মনস্তত্ত্বের এখানে অবকাশ নেই। ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে পাঠককে ধাঁধিয়ে দেবারও সুযোগ নেই।

রাজকন্যা এখানে কোনোদিকে দৃকপাত না ক'রে সোজা পায়ে হেঁটে এসে রাখালের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে না, পুরলক্ষ্মীরা শাঁখ বাজায় না। নিঃশব্দে বিবাহ হয়ে যায়, এবং সে বিবাহ কারও চোখে কম পবিত্র ঠেকে না।

প্রথম গল্প আমি এদের নিয়ে লিখেছিলাম। সব চেয়ে আশ্চর্য হই, যখন মনে পড়ে, সেই গল্পের যে রাখাল তার বয়স বারো-তেরো বছরের বেশি ছিল না। এবং সেই যে রাজকন্যা সে ষোড়শী।

ফ্রয়েডের সাহায্যে এই রহস্যের হয়তো কিনারা করা যেতে পারে।

কিন্তু আমার মনে হয়, ব্যাপারটা তেমন জটিলও কিছু নয়। সে দিনের কিশোরের কাছে প্রেম দেহাতীত আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বয়সের অসামঞ্জস্য সেই আত্মসমর্পণে সাহায্যই করেছিল।

এই হচ্ছে আমার প্রথম গল্প রচনা,—ত্রুটি বহুল, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অক্ষম প্রয়াস। ছাপার হরফে এ লেখা প্রকাশ হয়নি। হবার কোনো যোগ্যতাও ছিল না। কিন্তু সেই অক্ষম প্রথম রচনায় সৃষ্টির যে আনন্দ আমি উপভোগ করেছিলাম, তা আজকের দিনের কোন আনন্দের চেয়ে কম নয়।

বেশ মনে পড়ে, এর পরে ক'টা দিন যেন আমার নেশার ঘোরে-ঘোরে কেটেছে। সমস্তদিন সকল খেলা ও কাজের মধ্যে আমি যেন সেই রাখাল আর রাজকন্যাকে স্বপ্ন দেখতাম। কত মধ্যাহ্নে প্রখর রোদে আমি নিজেই বেরিয়ে পড়েছি গৃহকোণ ছেড়ে আমাদের গ্রামের বুড়ো বটের দিকে। এক এক সময় মনে হত, আমার ওটা গল্প নয়, সত্যি। একটা আশ্চর্য দুপুরে বুড়ো বটের নীচে ওদের দুজনের দেখা একদিন পেয়েও যেতে পারি।

নিজের লেখা দু'বার পড়বার ধৈর্য আমার কখনই নেই। কিন্তু এই লেখাটি যে কতবার পড়েছিলাম এবং তার রস মনে মনে রোমন্থন করেছিলাম তার আর ইয়ত্তা নেই।

ভালোই করেছিলাম। নইলে নিজের লেখা সম্বন্ধে আমার স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল যে, আজকে এতদিন পরে এই গল্পটির কথা আমার মনেই পড়তো না, এবং রেডিও মারফৎ এই অক্ষম প্রথম প্রয়াসের কথা আপনাদের শোন্‌বার অবকাশও ঘটতো না।

মনোজ বসু

৭ই জুলাই, ১৯৪৫

তখন বছর সাতেক বয়স। বাবা বললেন, ও-ঘর থেকে বঙ্কিম বাবুর বইখানা আনতে। কে এই বঙ্কিম বাবু? বই লিখেছেন, মারা গিয়েও বেঁচে আছেন তিনি, দেশ-জোড়া নাম। মুহূর্তে সাব্যস্ত করে ফেললাম, আমিও বই লিখব, সকলে নাম করবে। ক্রিয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে—তখুনি বসে গেলাম কলম নিয়ে। কবিতার একটা সুবিধা, ছোট্ট হলেও ক্ষতি নেই—তাই কবিতা শুরু করলাম। ওরে বাবা, তরু-সরু-মরু-নরু—কর গুণে গুণে মিল খুঁজতে প্রাণান্ত। সমস্ত বেলা ধরে সাকুল্যে চারটে লাইন দাঁড়াল। সেই আমার প্রথম লেখা। এখনো মনে আছে, কিন্তু অত সাধনার জিনিষ, শুনে আপনারা হাসবেন, তাই চেপে যাচ্ছি।

সেই থেকে গল্প আর কবিতা পড়ার বিষম নেশা ধরে গেল। অভিভাবকের চটির আওয়াজ পেলেই গল্পের বই চকিতে পাঠ্য-বইয়ের নিচে ঢোকে। লেখাও চলেছে একটু আধটু। খুব সামাল হয়ে লিখতে হয়, লিখেই বার কয়েক পড়ে ছিঁড়ে ফেলি। ও-বয়সে শত্রু তো নানান দিকে,—বমাল সুদ্ধ কে কখন ধরিয়ে দেবে, ঠিক কি?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাহসও বাড়তে লাগল। কবিতা লিখে তখন আর আশ মিটছে না, গল্পও ধরেছি। অর্থাৎ ফুলের পিছনে ফলের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। ক্লাস সেভেনে উঠেছি, নতুন অ্যালজাব্রা ইত্যাদি কষতে কষতে মনে হচ্ছে, আর আমি কেউ-কেটা নই। বাড়ির পাশে পোষ্ট-অফিস। 'জয় দুর্গা' বলে দু-পয়সার টিকিট এঁটে দিলাম একটা গল্প ছেড়ে কলকাতার নাম-করা এক মাসিকের সম্পাদকের নামে। সেই

তখনই টনটনে আভিজাত্যবোধ হয়েছে লেখার সম্পর্কে—মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার! ছোট কাগজে কোন দিন আমি লেখা পাঠাই নি।

ডাকের সময় হলে বুক দুরু-দুরু করে। কি জানি কি খবর আসে কলকাতা থেকে! খবর এল যথাসময়ে। ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে নির্জন ডুমুর-তলায় গিয়ে পড়ি। পড়বার বেশি কিছু নয়, তিনটে কথা মাত্র সেদিনের আশাহত সজল-দৃষ্টি গ্রাম-বালিকের কথা ভেবে আজকে কৌতুক লাগছে। সম্পাদক কি নিষ্ঠুর! কত কষ্ট করে কতরকম ঘটনা জুড়ে-গেঁথে নিরেট বিশ পৃষ্ঠা আমি পাঠাতে পারলাম, আর প্রতিদানে তিনটের জায়গায় চারটে কথাও জুটল না সম্পাদকীয় ভাণ্ডারে!

কিন্তু দমে যাইনি। এইরকম গোটা তিনেক ছাড়লাম পর পর। একই জবাব। একবার করলাম কি—গল্প-লেখা স্লিপগুলো মাথায় মাথায় এঁটে দিলাম—যেন দৈবাৎ আঠা লেগে গেছে বুক পোষ্টে পাঠাবার সময়। ফেরত এলে দেখি, যা ভেবেছি তাই—আঁটা-পাতা যেমন তেমনি আছে, এত কষ্টের গল্প ওরা পড়ে না। তিনটে কথা মুখস্থ করে রেখেছে—'ছাপানো যাইবে না'। তাই লিখে লিখে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

শেষে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলাম, শত্রুতা নেই তো ওদের সঙ্গে, তবে কেন অমন করে? আমার হাতের লেখা বড্ড খারাপ—সেটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে হয় তো? ওরা ভাবে, সবে আঁকুড়ে সারা করেছি, গ্রাম্য-ইস্কুলে যে 'ক্লাস-সেভেন'-এ প্রমোশন পেয়েছি, এ গৌরব-পরিচয় ধরতে পারেনি বেচারিরা।

কালী বলে একজন ছিল, পাকা-হাতের প্যাঁচালো লেখা তার। বিস্তর তোয়াজ করে এবং শেষ অবধি আধসের জিলিপি খাইয়ে কালীর সঙ্গে রফা হল, একটা গল্প সে নকল করে দেবে। আধসের জিলিপির ফল পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। এবারকার জবাব গতানুগতিক নয়—অনেকগুলো কথা। 'লেখাটি বিবেচনাধীন রহিল, ফলাফল পরে জানাইব।' মনে মনে হাসি। গল্প পড়ে বাছাধনেরা তাজ্জব হয়ে

গেছেন ; 'বিবেচনাধীন রহিল' ওটা তো খালি পশার-রাখা কথা। কবে ছাপা হয়ে বেরোয়, সেদিকে এখন নজর রাখার দরকার।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল—না বেরুল লেখা, না জানতে পারি ফলাফল। একদিন আকস্মিকভাবে সমস্ত জানা গেল। পোষ্টমাষ্টার মশায়ের মুদিখানার দোকান ছিল। জিরেমরিচ কিনতে গিয়েছি,-জিরে মরিচ বেঁধে দিলেন আমার গল্পের একটা স্লিপ ছিঁড়ে।

কোথায় পেলেন ? আমার জিনিষ এ যে !

হুঁ—বলে ঘাড নাডলেন পোষ্ট-মাষ্টার। তোর নামেই এসেছিল। দেখলাম, বাজে লেখা কতকগুলো। তুই কি করবি, আমার তবু এই সব কাজে লাগছে। সাদা কাগজ হলে দিয়ে দিতাম, হাতের লেখা লিখতে পারতিস।

মনের দুঃখে সেদিন প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোথাও লেখা পাঠাব না , আর লিখবই না মোটে।

প্রথম প্রতিজ্ঞাটা বজায় রেখেছিলাম অনেক দিন—আট দশ বৎসর একটানা। দ্বিতীয়-টি মাত্র একমাস কি দু'মাস। না লিখে উপায় আছে ? দুরারোগ্য ব্যাধি। আপনাদের যাঁরা এ রোগে আক্রান্ত নন, কাজকর্ম ফেলে সাহিত্য লিখতে বসেন না, ঈর্ষ্যা করি তাঁদের। ক্যানসার আর সাহিত্য—এই দুটো রোগেরই অষুধ বেরোয় নি আজও। দারিদ্র্য, তাচ্ছিল্য, অপমান, অভিভাবকেব নির্মম পিটুনি—সাহিত্য ব্যাধি কিছুতে নিরাময় হয় না।

অনেক দিন কাটল তারপর। কলকাতায় থাকি, কলেজের পডা সমাধা হয়ে এসেছে। শহর-রাজ্যের ভিতর অহরহ গ্রাম আমাকে আবিষ্ট করে রাখত। পাডাগাঁয়ের ছেলে, বাডির সামনে বিল। ছেলে বয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি। চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধু-ধু করে। রাত্রিবেলা বাইরের উঠোনে দাঁডিয়ে দেখতাম, দূরে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। আলেয়া নাকি ঐগুলো। কল্পনা করতাম, কালো কালো ভয়াল অতিকায় জীব বিলের অন্ধকারে গডিয়ে বেডাচ্ছে শিকার ধরবার আশায়।

হাঁ করছে, আর আগুন বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। মুখ বন্ধ করলে আগুন নেই। পথিক গ্রামের আলো ভেবে ছোটে সেদিকে। দপ করে আবার আর একদিকে জ্বলে ওঠে। পাগল হয়ে পথিক ছুটোছুটি করে, আতঙ্কে চেতনা বিলুপ্ত হয়। আলেয়ার দল তখন চারিদিক থেকে ঘিরে এসে ধরে।

এই ভয়ঙ্কর বিল বর্ষায় সবুজ সজল-স্নিগ্ধ। দিগন্তব্যাপ্ত ধানক্ষেত আলের প্রান্ত শাপলা আব কলমিফুলে আলো হয়ে যায়। আল পেরিয়ে জলস্রোত বয়ে চলে, নৌকা-ডোঙা অবিবাম ছুটোছুটি করে। ধানবনের ভিতর থেকে হঠাৎ চাষীর গলাব গান ভেসে আসে—সখিসোনার প্রেম কাহিনী।

আবার প্রথম শীতে পাকা ধানে বিলের গেরুয়া রং। বাঁক-বোঝাই ভারে ভারে ধান নিয়ে আসছে, ঘরে ঘরে পাল পার্বন ভাসান-কবি-যাত্রাগান। ঢোল বাজছে এপাড়া-ওপাড়ায়। ধান খেযে খেযে ইঁদুর-গুলো অবধি মুটিয়ে সারা উঠান ছুটোছুটি করছে।

এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো তাদের দুঃখ-সুখ আশা-উল্লাস নিয়ে আমার মন জুড়ে রয়েছে। বিশাল বাংলাদেশকে চিনেছি আমি এদের মধ্য দিয়ে। এদের বিরহে বিষাক্ত হয়ে উঠত শহরের কলেজি-জীবন। হঠাৎ মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে এদের মধ্যে অজ্ঞাত-বাসে যেতাম। যেন ইট-পাথরের শুকনো ডাঙা থেকে ডুব-সাঁতার দিতে যেতাম জীবনের রস প্রাচুর্যের ভিতর। আলাদা ছিলাম না তাদের থেকে। তাদের কথা বলতাম, গল্প লিখতে গেলে প্রতিটি ছত্রে তারাই এসে উঁকি-ঝুঁকি মারত। এমনি করে তাদের মানস-সান্নিধ্য লাভ করতাম আমি, নাগরিক নিঃসঙ্গতার বেদনা ভুলে যেতাম। চোখের কত অশ্রু অন্তরের কত উল্লাস মিশিয়ে যে আমার সে-আমলের গল্পগুলোর সৃষ্টি!

ইতিমধ্যে ছোটখাট একটা বন্ধুচক্র গড়ে উঠেছে আমাদের, সবাই কিছু-না-কিছু লেখেন। বাইরের পাঠকের অভাবে এ-ওর পিঠ চাপড়ে তারিপ করি। সেই সময় এক-বন্ধুর প্ররোচনায় পড়ে ছেলে বয়সের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ফেললাম। ডাকযোগে এবার একটা নয়—একসঙ্গে তিনটে জবর বান নিক্ষেপ করলাম সেই সময়কার সবচেয়ে খ্যাতিমান

তিনখানা মাসিকপত্র লক্ষ্য করে। তাদের নাম করব না, বেখরচায় বিজ্ঞাপন কেন দেব বলুন? মনে করুন, 'ক' 'খ' 'গ' তাদের নাম। সপ্তাহ না যেতেই 'গ' সম্পাদকের চিঠি—'আপনি অনুগ্রহ করে যদি দেখা করেন······' কি মতলব কে জানে, হাতের মাথায় ডেকে নিয়ে কোন স্থূল রকমের শোধ তুলবেন নাকি?

সভয়ে গিয়ে তো হাজির হলাম। একটু পরে সম্পাদক ডাকলেন, পরাশর, আনো এইবার। এল লাঠি সোঁটা নয়—প্লেট-ভরতি সন্দেশ। ভরপেট খাইয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি নিলেন, বরাবরই যেন লিখি তাঁর কাগজে। 'ব'-কাগজখানা এখন নেই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে সবাই আমরা এমন তোড়ে লিখতে লাগলাম যে অত নিরেট নির্জলা মাল বাংলার পাঠক বরদাস্ত করতে পারলেন না।

যাই হোক, একটার ব্যাপার তো চুকল—আর দুটো তাক একদম ফসকে গেল নাকি? অনেক দিন কেটে গেল। তখন যা থাকে কপালে—সম্মুখ-সমরের প্লান এঁটে ফেললাম। কবি-বন্ধুর কাছ থেকে পথ-ঘাট অন্ধি-সন্ধি জেনে নিয়ে অকুতোভয়ে উঠলাম গিয়ে 'ক'-পত্রিকার সম্পাদকীয় অফিসে।

অফিসে যে কর্মচারীটি ছিলেন, তিনি খ্যাতিমান সাহিত্যিক। আজকে পরম বন্ধু তিনি আমার। সে দিনের কথা নিয়ে এখনো আমরা হাসাহাসি করি।

কি চাই আপনার?

একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম—

লেখা লেখা · লেখা। জ্বালাতন। কি লেখা? নাম কি?

গল্প—নাম হল 'বাঘ'।

বাঘের গল্প এ জায়গায় কেন? ছেলেদের কাগজে দিন গিয়ে।

সবিনয়ে বললাম, ভয়ের কিচ্ছু নেই। ঐ নামটা ছাড়া বাঘের বিন্দু বিসর্গ নেই গল্পটার মধ্যে। দেখুন না, কি গতি হয়েছে।

দেখতে হবে না, চলে গেছে।

উৎফুল্ল হয়ে বলি, কোথায় চলে গেছে? ছাপতে?

উঁহু। ফেরত গেছে। সে তো অনেক দিন। পান নি?

সহসা সদয় হয়ে বললেন, আচ্ছা—দেখে দিচ্ছি, কোন তারিখে পাঠানো হয়েছে।

কালো রঙের মোটা একটা খাতা খুললেন। পাতা উলটাতে উলটাতে এক জায়গায় থমকে গিয়ে বিস্ময়-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। অনতিস্ফুট কণ্ঠে বললেন, তাইতো—মনোনীত হয়েছে দেখছি।

ক-কাগজে লেখা বেরুবে, স্বর্গ মুঠোর ভিতর পেয়েছি বললে হয়। জিজ্ঞাসা করলাম, কবে বেরুবে?

তা বলতে পারিনে। ছ-মাসে হতে পারে; ছ-বছরেও হতে পারে।

ব্যস, ব্যস। ছ-বছরের বেশি নিশ্চয় নয়। পরম উল্লাসে বেরুলাম অফিস থেকে। একটি মাত্র ভাবনা, ছ-টা বছর কোন রকমে বেঁচে থেকে ছাপা গল্পটা রেখে যেতে পারলে হয়।

এর পর প্রতি মাসে ক-কাগজ বেরুলেই সূচিপত্র খুলে দেখি। অবশেষে সত্যি সত্যি ঘটল স্বপ্নাতীত ব্যাপার—গল্প বেরুল। কাগজের সর্বশেষ প্রান্তে ঠাসাঠাসি করে জায়গা হয়েছে।

কবি-বন্ধু বললেন, চলো—টাকা নিয়ে আসিগে ওদের অফিস থেকে, লেখার পারিশ্রমিক। খাওয়া যাবে।

বলে কি! ছেপেছে খরচপত্র করে, তার উপর টাকা দেবে আবার? কেমন বোকা! ছাপলেই মানুষ কৃতার্থ হয়ে যায়, টাকা দিতে যায় কেন ওরা?

সেই অপরাহ্ণের স্মৃতি কোনদিন ভুলব না। আধ অন্ধকার নিচের অফিস-ঘর। ভয়ঙ্কর আড্ডা জমেছে। টেবিলের মাঝখানে কচুরি আর চিনাবাদাম ভাজা। মুখ চলেছে সকলের—সাহিত্য-তর্ক ও কচুরি কর্তন সমান বিক্রমে চলেছে।

এরই মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে কবি-বন্ধু বললেন, এই সংখ্যায় এঁর গল্প বেরিয়েছে। তার দক্ষিণাটা—

কোন্ গল্প, বলুন দিকি—

প্রশ্নকর্তা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অজানা নূতন

লেখকের এই লেখা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে তাঁদের মধ্যে। মুহূর্তে ঐ টেবিলের পাশে আমারও জায়গা হয়ে গেল, কচুরি ও সাহিত্য তর্কে সমান অধিকার জন্মাল। বিভূতি বাবু ছাড়া সেই আসরে আর যে দুটি প্রখ্যাতনামার বন্ধুত্ব লাভ করলাম, তাঁরা হলেন সজনীকান্ত দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণার পরিমাণটা জানতে ওখান থেকে একবার সম্পাদকীয় অফিসে যেতে হল। দেখি, পাশা উলটে গেছে একেবারে।

আবার গল্প কবে দিচ্ছেন ? আছে তৈরি ?

আমিই বা ছাড়ব কেন ? পশার বজায় রেখে গম্ভীর চালে বললাম, বড্ড দেরি হয় আপনাদের ছাপতে।

দিয়েই দেখুন না। পরশুর মধ্যে দেন তো আসছে মাসেই বেরিয়ে যাবে।

আর কখনো দেরি হয়নি এরপর। অনেক লিখেছি ঐ কাগজে। অনেক ভালবাসা পেয়েছি ওঁদের সকলের কাছ থেকে।

ভাবছেন, বিজয়-রথ অতঃপর চলল বুঝি গড় গড় করে, আর কোথাও হোঁচট খেতে হয় নি। আমিও ভেবেছিলাম তাই। অকুণ্ঠ বিশ্বাসে একদিন সোজা গিয়ে উঠলাম খ-সম্পাদকের কাছে বাকি লেখাটার খবর নিতে।

অ্যাঁ ? কোন লেখাটার কথা বলছ ভাই ? নাম কি ?

রাত্রির রোমান্স—

রোমান্স-টোমান্সের জায়গা আমাদের কাগজে নয়। ঐ যে কত সব বেরুচ্ছে তোমাদের দলের, সেখানে দাওগে।

পড়ে দেখেছেন ?

নামটা পড়েছি। পড়ে ফেলে দিয়েছি ঝুড়ির মধ্যে। দেখ তো। যদি থাকে, নিয়ে চলে যাও ভাই—

এই অবমানিত 'রাত্রির রোমান্স' গ-সম্পাদক এক রকম কেড়ে নিয়েই পরের মাসে ছেপে দিলেন। 'বনমর্মর' বইয়ে আছে লেখাটা। হাতের কাছে যদি কখনো পান, পড়ে দেখবেন তো রুচিবান কাগজে একেবারে অচল কি না।

শিবরাম চক্রবর্তী

৩০শে জুন, ১৯৪৫

আর সকলের মতো, আমার প্রথম গল্পও অতি কাঁচা বয়সের কাণ্ড। একেবারে ছোটবেলার এবং তার শ্রোতা বা সমঝদারও মাত্র একজন। স্বভাবতই তিনি—মা।

—"তুমি জিনিষ কিনতে যে দুয়ানিটা দিলে মা, সেটা কোথায় যেন পড়ে গেল।"

এই কথা যেদিন প্রথম মা-কে বলেচি, বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলতে পেরেচি, বলতে গেলে আমার প্রথম গল্প ঠিক তখনকারই রচনা।

অবিশ্যি, ধরতে গেলে, আমার প্রথম গল্প শোনাও মার মুখ থেকে। অতএব মাকেই গল্প শোনানো—কিছুটা প্রতিশোধ-স্পৃহার থেকে প্রণোদিত হয়ত বলা যায়।

তবে বাল্যকালের লেখা এবং পরকালের লেখায় পার্থক্য আছে। দুইই পড়বার জিনিষ—প্রথমটা চাপা আর পরেরটা ছাপা। এই চাপা পড়া লেখাদের সমাধিস্তূপ থেকে ছাপা পড়া লেখাটির আবির্ভাবের মধ্যে ব্যবধান থাকে—সময়ের ব্যবধান। প্রথম রচনা এবং প্রথম প্রকাশনা এই দুয়ের মধ্যে অনেক ফারাক্। এবং ফাঁড়া অনেক।

আমার প্রথম প্রকাশিত সেই লেখা কিন্তু গল্প নয়। তা হচ্ছে কবিতা, বলাই বাহুল্য। একটা বয়স আছে যখন কবিতা ঠিক দাড়ির মতই, আপনা থেকে বেরিয়ে আসে। কবিতা আর দাড়ি, বলতে কি,

প্রায় এক সঙ্গেই সুরু হয়। অযাচিতই এসে যায়—সেই প্রথম বয়সটায়। কিন্তু গল্প (মানে রীতিমত গল্প) তখন কিছুতেই আসে না।

গল্পকে আনা ভারী দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে কোন বয়সেই অনেক টেনে হিঁচড়ে তাকে আনতে হয়। গল্পরা তো কবিতার মত, কিংবা দাড়ির মত নিজের ভেতর থেকে আপন প্রেরণায় গজিয়ে ওঠে না, তারা ছড়িয়ে থাকে মানুষের জীবনের পাতায় পাতায়। আপনার আমার—এর ওর তার জীবনের পৃষ্ঠায় তার প্রকাশ। সেখান থেকে তাদের দেখে শুনে বেছে চুনে ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে হয়। তারপর নিজের পছন্দসই পোষাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বার করতে হয় সবাইকার সামনে।

প্রথম বয়সে গল্প সাজানো এক দারুণ সাজা। কেবল গল্পের পক্ষে নয়, লেখকের পক্ষেও ; এবং সে গল্প যদি পাঠককে পড়তে হয় তাহলে তার পক্ষেও কম সাজা নয়। আমার প্রথম গল্প কতদিন আগেকার লেখা আমার মনে নেই, কিন্তু সে যে কত কষ্ট করে লেখা তা এখনো আমি ভুলতে পারিনি। আমার সেই প্রথম গল্প লেখার গল্পই আপনাদের বলতে যাচ্ছি।

আপনারা আমার গল্প পড়েছেন কিনা জানিনে। যদি ভুলক্রমে এক আধখানা কখনো উল্‌টে থাকেন তাহলে হয়ত আপনাদের মনে হয়েছে স্রেফ গাঁজা। কারো কারো এরূপ মনে হয়, এবং কেবল মনে হওয়াই নয়, মুখ ফুটে কেউ কেউ একথা অকপটে ব্যক্তও করেন। কিন্তু আমি জানি, আমার প্রায় সব গল্পই সত্য ঘটনা, এই জীবনে, হয়ত এই অধমকে নিয়েই দুর্ঘটিত, এবং তার কোনটাই গাঁজা নয়, হয়ত বা কোথাও একটু অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাহলেও তা আমার এই জীবন থেকে গাঁজানো।

আমার প্রথম গল্পটাও ঠিক এইভাবেই অকস্মাৎ আমার জীবন থেকে গেঁজে উঠেছিল। জীবন থেকে গল্প গেঁজে ওঠা যে কী ব্যাপার তা এই কাহিনী শুনলেই আপনারা টের পাবেন। আমার গল্পরা যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজে গুজে আপনাদের সমক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের দেখে হয়ত হাস্যকর বলে মনে হলেও হতে পারে কিন্তু যখন আমার

সামনে বা আমার আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে নিয়ে, গাঁজতে থাকে তখন তা দস্তুরমতই গঞ্জনাদায়ক। মোটেই হাস্যকর নয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে তো নয়। জীবনকে, এই জন্যেই বুঝি অনেকে ট্র্যাজেডি বলে থাকেন। তাঁরা মিথ্যা বলেন না। আমার জীবনের ট্র্যাজিডিগুলো গল্পাকারে লিখতে গিয়ে, লেখার দোষে কিম্বা লেখকের অক্ষমতায় হয়ত হাস্যকর হয়ে দেখা দিয়েছে—কিন্তু তা পড়ে আপনাদের হাসি পেলেও, আমার গল্প পড়ে আমার নিজের কখনই হাসি পায় না।

আমার এই প্রথম গল্পটাও ঠিক এমনি করেই গজিয়েছিল। শুনুন তাহলে। সেদিন ছিল পয়লা বোশেখ। কলম নিয়ে বসে কি লিখি কি লিখি করছিলাম। কিছুই আসছিল না কলমে। নিজেকে নিজ মনে বলছিলাম, গল্প হচ্ছে জীবন দর্শন, জীবনকে কোথায় কিভাবে দেখেছ মনে করো, ভেবে ভেবে দ্যাখো, তারপরে তার মধ্যে একটু দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্যাজাল মিশিয়ে লিখে ফ্যালো। লোকচক্ষে এনে বার করা তার পরের কথা। বলি, জীবনের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে?

যতবারই এই প্রশ্ন তুলি ততবারই জীবন বাবু বলে এক ব্যক্তির ছবি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে; আসল জীবনের আর দেখা পাই না।

অবশেষে বিরক্ত হয়ে কলম ফেলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলাম। সামনেই পড়েছিল রিসিভারটা, আমার টেবিলের এককোণে। এবং সেই মুহূর্তেই জীবনের সাক্ষাৎ লাভ করলাম। আমার প্রথম জীবনসাক্ষাৎ। আর সেই ঘটনা কিম্বা দুর্ঘটনা থেকেই আমার প্রথম গল্প গেঁজে উঠলো। সাক্ষাৎ জীবন থেকে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে এল গল্পটা!—

কাকে ফোন করা যায়? টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে ভাবছিলাম। আজ সম্বচ্ছরের প্রথম দিন—কাউকে ডেকে নতুন বছরের সাদর সম্ভাষণ জানালে কেমন হয়!

কিন্তু কাকে জানাই? কাকে আবার? যাকে তাকে, যাকে খুশী, তাকেই। আজকের দিনে কে আপনার, কেইবা পর? একধার

থেকে ডেকে ডেকে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিই। সেই কি ঠিক নয়?

টেলিফোন ডিরেক্টরী নিয়ে নাড়াচাড়া করি। অসংখ্য নাম! নম্বরও বহুৎ! কোন্ধার থেকে সুরু করব?

চক্রবর্ত্তীদের নিয়েই আরম্ভ করা যাক্ না কেন? চ্যারিটি বিগিন্স্ য়্যাট হোম্। তাছাড়া বঙ্কিমবাবুও বলে গেছেন—কী বলে গেছেন? না, চক্রবর্ত্তীদের সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলেন নি, তবে চক্রবর্ত্তীদের সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। একটু ঘুরিয়েই বল্তে হয়, বলতে গেলে। হ্যাঁ,—চক্রবর্ত্তীকে চক্রবর্ত্তী না ডাকিলে কে ডাকিবে?

অতএব একে একে চক্রবর্ত্তীদের ধরে ধরে ডেকে যাই। এবং মিষ্টি করে নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। আমার দ্বারা তাদের চক্রবর্ত্তী সুলভ যৎকিঞ্চিৎ জীবনে কিছু কিছু পুলকের সঞ্চার হোক্। ক্ষতি কি?

চক্রবর্ত্তীও খুব কম নেই। তারাই দেড়গজ জুড়ে আছে বইটা'র। কলকাতার ফুটপাথ হতে পারে, কিন্তু টেলিফোনও যে এত চক্রবর্ত্তী-বহুল এ আমার ধারণা ছিল না। যাই হোক্, প্রথম একটা চক্রবর্ত্তীকে পছন্দ করলাম, এবং টেলিফোনটা কাছে এনে রিসিভারটা তুলে ধরলাম,—যথারীতি নম্বর বলা হোলো। অনেকক্ষণ ধরে কোন সাড়াশব্দ নেই। হালখাতায় বেরিয়ে গেছেন নাকি ভদ্রলোক? এত বেলা থাকতেই? তা, চক্রবর্ত্তীরা যেরূপ মিষ্টান্নইচ্ছুক এবং উদর-হৃদয়, কিছু বিচিত্র নয়।

বহুক্ষণ বাদে একটা আওয়াজ এলো। মাছের মুড়ো মুখে করে কে একজন কথা বল্ছে বোধ হোলো যেন।

"রং নম্বর! রং নম্বর! রং নম্—" বলতে বলতেই নিরুদ্দেশে মিলিয়ে গেল সেই আওয়াজ!

আমার বিরক্তি লাগে। নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ করতে বসে মন্দ নয়।

আমি রিং করতে সুরু করি ফের!

আওয়াজটা আবার ঘুরে আসে—এসে জানায়: "নাম্বার এনগেজ্ড।"

এবং এই বলেই আওয়াজটা আবার উধাও হবার চেষ্টা করে, কিন্তু

আমিও নাছোড়বান্দা। "শুনুন মশাই, শুনুন।"—উপরচডাও হয়ে আওয়াজটাকে পাকড়ে ফেলি।

"বলুন! বলুন তাহলে!" আওয়াজটা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে মনে হয়।

"আপনিই শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী?" আমি বলি।

"না!" মেগাফোন-বিনিন্দিত কণ্ঠে উনি জবাব দিলেন।

"আপনি—আপনি কে তবে?"

"এই! এই ঠাকুর! ইলিশ মাছের রোসট কই আমার? রোস্‌ট্? —যাও, নিয়ে এসো জল্‌দি! য়্যাঁ, কী বল্‌ছেন? আমি? আমি কে? বলেছি তো আমি রং নম্বর! তার ওপরে, আমি এখন এনগেজড।"

তারপর আর কোন উচ্চবাচ্যই নেই।

কিন্তু আমিও সহজে পরাস্ত হবার পাত্র না।

এ-বেচারি এখন নাচার—রোস্‌ট্‌লেস্ বলে' হয়ত রেস্‌ট্‌লেস এবং চক্রবর্ত্তীও নয় হয়তো। দেখে শুনে দ্বিতীয় এক চক্রবর্ত্তীকে ডাক দিই।

"আপনিই কি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী?"

"হ্যাঁ, আপনি কে?"

নিজের নাম বল্‌লাম।

টেলিফোনের অপর প্রান্তবর্ত্তী সশব্দে কেটে পড়লেন।

"আপনাকে তো আমি চিনি না। নামও শুনি নি কক্ষনো! আমার কাছে কী দরকার আপনার?"

"আজ্ঞে, দরকার এমন কিছু না। কেবল আপনাকে আমার নমস্কার—অর্থাৎ—এই নববর্ষের—"

"কে হে বদ্ ছোকরা? ইয়ার্কি দেবার আর জায়গা পাওনি? আধঘণ্টা ধরে রিং করে অনর্থক বাথরুম থেকে টেনে আন্‌লে আমায়? এখন ঠাণ্ডা লেগে আমার সর্দ্দি হবে, সর্দ্দি বসে গিয়ে ব্রংকাইটিস্ হবে। তার পরে নিউমোনিয়া হয়ে নিমতলা হয় কিনা কে জানে! হায় হায়, তোমার মত গুণ্ডার পাল্লায় পড়ে বেঘোরে আমি মারা পড়লাম।"

এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কনেকশন কেটে দিলেন, নববর্ষ অবধি হয়ে

থাকলো, সাদর সম্ভাষণটা ভালো করে জানাবার ফুরসৎটুকুও পাওয়া গেল না! সে অবকাশ তিনি আমায় দিলেন না।

আবার ডাক দিতে হোলো ভদ্রলোককে। দুঃখের সহিত, বাথরুম থেকেই হয়ত টেনে আন্‌তে হোলো আবার। কী করব? কোনো কাজ অসামাপ্ত কিম্বা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখা ঠিক নয়। আজকের দিনে অন্ততঃ -নতুন বছরের নবীন সম্ভাষণ—বিশেষ করে'।

"আপনিই মিষ্টার চক্রবর্ত্তী?"

"আলবৎ! আমিই সেই! তুমি কোন বেয়াক্কেলে?"

"আজ্ঞে, আমি—আমি—" আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌তে যাই।

"একটু আগেই তো আমার জবাব দিয়েছি, আবার কেন? আচ্ছা তাঁদোর তো!—"

এই বলে সশব্দেই তাঁর বিসিভার ত্যাগ করলেন, স্বকর্ণেই শুন্‌তে পেলাম। আমাকে পবিত্যাগ করে আবার বাথরুমেই প্রস্থান করলেন বোধ হয। নাঃ, উনি ওঁর জীবনকে আনন্দোজ্জ্বল করতে সমুৎসুক নন্। অন্ততঃ বর্ত্তমানে তো নয, বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

তালিকার তৃতীয় ব্যক্তিকে টানি এবার।

"শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী আপনি?"

"ঠিকই ধরেছেন। আপনি কে?

"আমিও আরেক শ্রীযুত—আজ্ঞে হ্যাঁ,—চক্রবর্ত্তীই।"

"ও, তাই নাকি?" চোখা গলায বল্‌তে সুরু করেন তৃতীয় ব্যক্তি:

"দুহপ্তা ধরে' আমি গরু খোঁজা করছি আপনাকে। সেই যে আপনি কেটে পড়লেন দালালীর টাকাটা মেরে—তারপর আপনার আর কোনো পাত্তাই নেই। আচ্ছা লোক আপনি যাহোক। আপনার আক্কেলকে বলিহারি।"

আমি একটু বিব্রতই বোধ করি। সাদর সম্ভাষণের পূর্ব্বেই একজন অপরিচিতের কাছ থেকে এতটা মোলায়েম অভ্যর্থনা—এমন সাগ্রহ হাপিত্যেশ আমি প্রত্যাশা করিনি! বিশেষ করে একটু আগেই, দু'দুটো সংঘর্ষ সামলাবার ঠিক পরেই। আমি তো কেবল সম্ভাষণ করেই সারতে

চাই এবং সরতে চাই। তারপরে আর কিছু চাই না। কিন্তু ইনি তো দেখছি তারও বেশী অগ্রসর হতে উৎসুক। যেভাবে—যেরূপ গোরুতর ভাবে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন, বল্লেন, তাতে হয়তো এর পরেও রীতিমত ঘনিষ্টতা জমাবার পক্ষপাতী বলেই তাঁকে মনে হয়।

আমার তরফে বাক্যস্ফূর্ত্তি হতে বিলম্ব হয়, স্বভাবতঃই একটু সময় লাগে।

"একি! চেপে গেলেন যে একেবারে;"—অন্য তরফে ততক্ষণে সম্ভাষণের দ্বিতীয় দফা সুরু হয়ে যায়: "বেশ ভদ্রলোক আপনি! দালালীর টাকাটাতো অক্লেশে মেরে নিয়ে যেতে পারলেন, কিন্তু এই পচা বাড়ীতে কোনো মানুষ বাস করে? এঁদো, ড্যাম্প, মশার আড্ডায়, কাঁকড়া বিছের সঙ্গে থাক্‌তে পারে কেউ? এরকম বাড়ী আমাদের ভাড়া গছিয়ে, এভাবে ঠকিয়ে, কী লাভ হোলো আপনার শুনি?"

এবার আমাকেই কনেকশন কাট্‌-আপ্ করতে হোলো, সম্বন্ধ বজায় রাখা আর সম্ভব হোলো না। বিদায়-সম্ভাষণ না করেই সাদর সম্ভাষণ স্থগিত রাখতে হোলো বাধ্য হয়েই—কি করব?

এবার চতুর্থ ব্যক্তির উদ্দেশে ডাক ছাড়ি। এবং তাঁকে কাছাকাছি পাবা মাত্রই আর অন্য কথা পাড়তে দিই না, সর্ব্ব-প্রথমেই আমার কাজ সেরে নিই:

"শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী! আপনাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ।"

কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব আসে: "তা জানাবে বৈকি! তা না হলে বন্ধু? তা না জানাবে কেন? আজতো তোমাদেরই সুখের দিন হে, তোমাদেরই আনন্দ! এতদিনে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, পরশু মামলায় হেরেছি, কাল শ্বশুরমশাই আত্মহত্যা করেছেন, আর আজ সকাল থেকে যতো কাবলেওলায় ছেঁকে ধরেছে, আগামীকাল আমাকে দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হবে, আজই তো তোমাদের মত হিতৈষীদের আনন্দ উথলে ওঠবার দিন! আমার সর্ব্বনাশ না হলে আর তোমাদের পৌষমাস ফলাও হবে কি করে?"

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আর্ত্তনাদ উচ্ছ্বসিত হতে থাকে।

এ ব্যক্তিকেও, এই চক্রবর্ত্তীটিকেও, আমি বরখাস্ত করে দিই—তৎক্ষণাৎ। যে রকম বুঝছি, সব দিক থেকেই আমার সাদর সম্ভাষণের একদম্ অযোগ্য বলেই বোধ হচ্ছে। নববর্ষের জন্যে একেবারেই ইনি প্রস্তুত নন। অতঃপর, পঞ্চম চক্রবর্ত্তীকে বেশ একটু ভয়ে ভয়েই ডাক্‌তে হয়।

সাড়া দিতে না দিতেই সম্বলব্ধ চক্রবর্ত্তী মশাই আরম্ভ করেন—"বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। গলা শুন্‌তেই চিনেছি। তা সুদটা দিচ্ছেন কবে? আসল দেবার তো নামটি নেই। কতো জমে গেল খেয়াল আছে? য়্যাঁ? একেবারে উচ্চবাচ্যই নেই যে! ঢের ঢের লোক দেখেছি বাবা, কিন্তু তোমার মতন এক নম্বরের এমন জোচ্চোর আর একটাও চোখে পড়ল না! একবার যদি সামনে পেতাম—মেরে পস্তা ওড়াতাম তোমার।"

আর বেশী শোনবার আমার সাহস হোলো না। পস্তায়মান এই ধারদাতার ধারালো ধাক্কায় আমি কাহিল হয়ে পড়লাম। তা ছাড়া, সামান্য একজন, সাধারণ একজন চক্রবর্ত্তীকেই আমি ডাক্‌তে চেয়েছিলাম, কোনো রাজচক্রবর্ত্তীকে না।

বহুক্ষণ চুপ করে থাকি।

তারপর অনেক ইতস্তত করে ষষ্ঠব্যক্তির জন্য রিসিভার তুলি—! কথায় বলে, বার বার তিনবার। আবার তিনে শত্রুতাও হয়, বলে থাকে। অতএব, কার্য্যতঃ, তিনবারের ডবল করেই, তবেই ছাড়া উচিত—।

"হ্যালো, আপনি কি শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী? ও, আপনি? নমস্কার! আমি? আমিও একজন চক্রবর্ত্তী—! আপনারই সগোত্র একজন! হ্যাঁ, নমস্কার! আজ নববর্ষের প্রথম দিনটিতেই আপনাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি! সাদর সম্ভাষণ- আজ্ঞে হ্যাঁ!"

অন্য তরফ থেকে অন্যতর চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—বেশ গদগদস্বরে। মোলায়েম আর মিহি হয়ে। এ চক্রবর্ত্তীটিকে অন্যান্য

চক্রবর্ত্তী থেকে স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। বঙ্কিমবাবুর কথাটার রকমফের এঁরও জানা আছে মনে হচ্ছে।

তিনি বল্‌তে থাকেন—"ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কি বল্লেন? নামটা তো বল্লেন, কিন্তু আপনার ঠিকানাটা? একশো চৌত্রিশ নম্বর, বেশ বেশ। রাস্তার নাম? বাঃ! নাম ঠিকানায় কবিতা মিলিয়ে হরিহরাত্মা হয়ে আছেন দেখছি—বাঃ—বাঃ! এই তো চাই। ছেলেপিলে কটি? আপনিই একমাত্র? তার মানে? ও—এখনো বিয়েই হয়নি? হবার আর আশঙ্কাও নেই? তা না থাক্। মানুষ আশাতেই, এমন কি, আশঙ্কা নিয়েও বেঁচে থাকে। বয়েসটা কতো বল্লেন? আন্দাজ করা একটু কঠিন? আটাশ থেকে আটাশীর মধ্যে? তাহলে—তাহলেই চলবে। এত কথা জিগ্যেস করছি কেন? এক্ষুনি জানতে পারবেন, এক্ষুনি আমি যাচ্ছি আপনার কাছে। না না, কোন ঘটকালি নয়। তবে আপনি যেমন আমাকে সাদর সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করলেন, তেঁমনি আজ নববর্ষের প্রথম দিনে একটা ভালো কাজ আপনার জন্যও আমি করতে চাই। আপনার জীবনবীমাটা আজই করে ফেলুন। শুভকাজ দিয়েই বছরের প্রথম শুভ দিনটা সার্থক হোক্। কেমন? দাঁড়ান, এই দণ্ডেই আমি যাচ্ছি।"

এই প্রত্যুত্তরলাভের পর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, কি বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম আমার মনে নেই। তবে এই কাণ্ড থেকেই খাতার পাতা ভেদ করে আমার প্রথম গল্পের পল্লব গজিয়েছিল। এবং সেই গল্প এতদিন ধরে অনাদরে পড়েছিল আমার কাছে। পড়েছিল বলেই আজ আপনাদের আমার প্রথম লেখা এবং কি করে তা লেখা—জানাবার এই সুযোগ আমার হোলো। এর জন্য যা কিছু ধন্যবাদ তা কোনো এক বা অনেক সম্পাদকের প্রাপ্য, লেখাটা তাঁদের দরবার থেকে অমনোনীত হয়ে উপর্য্যপরি ফেরৎ না এলে আজ আর এইরূপে, এহেন অভাবিত ভাবে, ঈথারের সাহায্যে বিস্তার লাভ করার এমন সৌভাগ্য এর হোতো কি-না সন্দেহ।

১৪ই জুলাই, ১৯৪৫

আমার প্রথম মুদ্রিত গল্প 'শুধু কেরাণী'।

কিন্তু প্রথম গল্প লেখা আর প্রথম গল্প ছাপা হওয়া নিশ্চয় এক কথা নয়। এই দুইয়ের মধ্যে একটা জীবনের কত বিনিদ্র বেদনা কত হতাশা দীর্ঘশ্বাসের ব্যবধান যে থাকতে পারে তার সীমা পরিসীমা হয় না।

গল্প লেখবার কলম যাঁরা কখনও ধরেছেন, সুযোগ সুবিধা সৌভাগ্য অনুযায়ী এই ব্যবধানের সঙ্গে অল্প বিস্তর পরিচয় তাঁদের সবারই বোধ হয় আছে। প্রথম হাতে লেখা গল্পের পাতা থেকে ছাঁপান গল্পের অপরূপ সুদূর রহস্যময় সমুদ্রতীরের দিকে চেয়ে, একবারও আকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নি, এমন সাহিত্যিক বোধ হয় বিরল। তাই বলছিলাম প্রথম গল্প লেখা মানে প্রথম মুদ্রিত গল্প নিশ্চয় নয়।

প্রথম গল্প বলতে যে গল্প ছাপার হরফের সন্ধান পেয়েছে তা যদি না বুঝি, তাহ'লে অবশ্য অনেকখানি পিছিয়ে গিয়েও ঠিক সুরু করবার মত জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গল্প লেখা হয় বটে কলমে, কিন্তু তার বহু আগেই, মনে মনে তার অস্পষ্ট আয়োজন চলতে থাকে। সে আয়োজন সেই ছেলে বেলাতেই সুরু, যখন কল্পনার পক্ষীরাজ একটু ইসারা পেলেই দিগ্বিদিকে উধাও হবার জন্যে তৈরী, যখন সব রাস্তা নিয়েছে অজানা রূপকথার পুরীর দেশে, যখন সব কিছুর মধ্যেই অফুরন্ত রহস্য লুকোন। সত্য মিথ্যা আজগুবি যা কিছু গল্প তখন শুনেছি, তৃপ্তিহীন মন সে-সবই আবার নতুন করে নতুন ছাঁদে বুনতে চেয়েছে।

এখনকার ছেলেমেয়েরা ঠিক আমাদের মত সৌখিন কিনা জানিনা, আমাদের কিন্তু রূপকথার গল্পটি বই পড়ে জানতে হয় নি। রূপকথা কেন, রামায়ন মহভারতের যতটুকু আমাদের জানবার মত, অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে মার মুখেই সে সব গল্প আমি শুনেছিলাম। বড় হয়ে বইএর ভিতর দিয়ে সে সব গল্পের সঙ্গে যখন আবার পরিচয় হল তখন দেখলাম কোন কিছুই আমার একেবারে অচেনা নয়।

মনের মধ্যে গল্পের আসর এমনি করে হয়ত অনেকেরই পাতা থাকে, শুধু সবার বেলায় তাতে গিয়ে বসবার স্থযোগ স্থবিধা উৎসাহ আর হয়ে ওঠে না। আমার নিজের কথা অন্ততঃ বলতে পারি যে, ছেলেবেলায় গল্প লেখবার বা সাহিত্যিক হবার কোন সাধ কোনদিন অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না। বন্ধুবান্ধবের অনেকের বেলায় দেখেছি ও জেনেছি যে, ভবিষ্যতে সাহিত্যকে জীবনের ব্রত বলে যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের ছেলেবেলা থেকেই লেখার তাগিদ মনের মধ্যে থাকে। ফল ভালো করে পেকে উঠে কোন বয়সে যে ফলবে তার কোন নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, কিন্তু ফল ধরবার অনেক আগে থেকেই অনেকের মনে ফুলের কুঁড়ি ধরে থাকে।

বছর চোদ্দ বয়স পর্য্যন্ত সে রকম কোন কুঁড়ি আমার মনে অন্ততঃ ছিল না। সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগ অবশ্য ছিল যথেষ্ট, ভালো মন্দ সরেস নিরেস সব রকম বইএরই একরকম পোকা ছিলাম বল্লেই হয়, কিন্তু কোনদিন নিজে কলম ধরে এই সব লিখিয়ের দলে আসন পাবার জন্তে চেষ্টা করব তা ভাবিনি।

বছর চোদ্দ বয়সে হঠাৎ একদিন কি খেয়ালে স্বর্গতঃ ডি এল রায়কে বহু নকল করে হিমালয় সম্বন্ধে এক কবিতা যে লিখে ফেলেছিলাম কখন ঠিক মনে নেই। সেই কবিতাই এক রকম কাল হ'ল বলা যায়। তখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি। আমাদের বাংলা যিনি পড়াতেন সেই পণ্ডিত মশাই কবিতাটি হঠাৎ দেখে ফেল্লেন,—হঠাৎ দেখে ফেলার মধ্যে আমার কিছু হাত ছিল না একথা হলফ করে বলতে পারব না। কবিতাটি পড়ে তিনি একেবারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বসলেন এবং হঠাৎ ক্লাশের

মধ্যে নিজেকে একটা কেষ্টো বিষ্টু গোছের মনে করে আমার আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়তে চাইল না।

কিন্তু হায় এ আত্মপ্রসাদ ক্ষণস্থায়ী। স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের ভিতর দিয়ে তিনটি ছেলের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। পড়াশুনায়, বুদ্ধিতে ও বয়সে তিনজনেই আমার চেয়ে বড়। বাংলা ক্লাসটাই সেদিনকার স্কুলের বুঝি শেষ পিরিয়াড। ক্লাসের ছুটির পর তিনজনে মিলে আমার কবিতাটিকে সমালোচনার কাঁচিতে একেবারে কেটে কুটি কুটি করে দিলে। আমার নবার্জিত কবিখ্যাতি তাদের আক্রমণে এক নিমেষে একবারে ফানুষের মত ফুটো হয়ে চুপসে গেল। তাদের সমালোচনায় ঈর্ষার কোন বাষ্প ছিল না বলে নিজের কবিতাটির আসল চেহারা আমার কাছেও অস্পষ্ট হয়ে রইল না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু কাজ যদি করে থাকি তার জন্যে এই তিনটি বন্ধুর কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তাই অপরের কাছে কতখানি মূল্য পাবে বিচার না করেই তাদের নাম এখানে স্মরণ না করে পারছিনা। বন্ধুদের মধ্যে স্কুমার ও অনাথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এ জগতে নেই। তৃতীয় বন্ধু এমানুল হক্ বহুদিন আগে আমেরিকায় চলে গেছল এইটুকুই জানি। আর কোন খবর তার পাই নি।

বন্ধু তিনজন শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করাবার জন্যেও সেদিন থেকে উঠে পড়ে লেগেছিল। হক্ তার পরদিন তার নিজের লেখা একটি কবিতা আমায় এনে দেখিয়েছিল মনে আছে। সে কবিতার মধ্যে যে শক্তির আভাষ ছিল, তা কেন ফুটে ওঠবার স্থযোগ পায়নি বলতে পারি না। কিন্তু স্থযোগ পেলে আজকের সাহিত্যে তার নাম কারুর অবিদিত থাকত না বলেই এখনও আমার বিশ্বাস।

বন্ধুদের সমালোচনা ও উৎসাহে লেখার জেদ সেই প্রথম আমার চেপে বসল। খাতার পর খাতার পাতা ভর্ত্তি হয়ে উঠতে লাগল কবিতায়। কিন্তু এ উৎসাহের জোয়ার খুব বেশীদিন বোধহয় ছিল না। কাগজে কোন লেখা ছাপাতে দেবারও কোন আগ্রহ তখন

অনুভব করিনি। দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পড়িয়েই খ্যাতির সাধ মিটে গেছে।

স্কুলের পড়া শেষ হ'ল। কবিতার স্রোতেও ভাঁটা পড়ল। ডাক্তারী পড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকায় তখন কলেজে পড়ি। সাহিত্য কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খোঁজ খবর রাখি বটে কিন্তু সে শুধু পাঠকের কৌতূহল নিয়ে। সে রাজ্যে নিজে কোনদিন আর প্রবেশ করবার চেষ্টা করব একথা তখন ভাবতেই পারি না।

তখন ভারতী পত্রিকা প্রায় অস্তমিত। সাহিত্যের দিগন্তে ক্ষীণ একটি তারার আলো নিয়ে কল্লোল কাগজটির উদয় হয়েছে, কিন্তু খুব বেশী লোকের নজরে পড়েছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বব্যাপী প্রতিভার দীপ্তিতে দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত ত বটেই কিন্তু তারই মধ্যে নতুন এক আগন্তুক আমাদের বয়সী পাঠক পাঠিকাদের মনোহরণ করেছেন। মনীন্দ্রলাল বসুর প্রেমের গল্পেই তখন সাহিত্যের আসর মাৎ হয়ে গেছে। একটি আবছা-কোমল মিষ্টি আবহাওয়ায় গল্প সাহিত্য তখন প্রেমের দিবা-স্বপ্নে মশগুল।

এমনি সময়ে একবার গ্রীষ্মের ছুটি কলকাতায় কাটাতে উঠলাম এসে একটি মেসে। কলকাতায় এক নগন্য গলি বহুকালের পুরাণো এক বিশাল ভাঙা বাড়ি। বাড়িটির নাকি এককালে অত্যন্ত বদ্‌নাম ছিল। সেখানে পরপর কয়েকটি পরিবারের সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটার দরুণ, বহুকাল সে বাড়িতে থাকতে কেউ সাহস করেনি। এই বদ্‌নামের সুযোগ নিয়ে মেসের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা তাঁরা অত্যন্ত সস্তা ভাড়ায় সেটি দখল করেছিলেন। তখনকার দিনের পক্ষেও সে মেসের সীটরেণ্ট ও অন্যান্য খরচা অত্যন্ত কম ছিল। সেই মেসের একটি দোতালার ঘরে আমি জায়গা পেলাম।

দু'চারদিন সেখানে থেকেই বুঝলাম ভুতুড়ে বাড়ি হিসাবে অখ্যাতি কেনবার যথেষ্ট কারণ তার আছে। যে বদ্ধ গলিটি দিয়ে বাড়িটিতে পৌছাতে হয় সেই দিকটি ছাড়া বাড়িটির আর সকল দিকই বহুকালের পরিত্যক্ত পচা ডোবা ও জঙ্গলময় একটা বাগান দিয়ে ঘেরা। আমার

ঘরের জানলা খুলেই সে বাগান চোখে পড়ে। দিনের বেলাতেই সেখানে ঘন গাছের ঝোপে অন্ধকার। রাত্রে ইচ্ছে করলে সেদিকে চেয়ে বেশ একটা গা ছমছমে ভাব মনে আনা যায়।

আমার প্রথম ছাপান গল্প এই বাড়িটির ওই ঘরটিতেই এক নিশুতি রাত্রে লেখা। পরিবেশ ও আবহাওয়া ভূতের গল্পের পক্ষে অনুকূল হলেও গল্পটি তা বলে ভুতুড়ে নয়। সে গল্প শুধু এক কেরাণীর। গল্পের নামও ছিল 'শুধু কেরাণী'।

কি করে কেন যে সে গল্প হঠাৎ সেদিন লিখেছিলাম বেশ ভালোই মনে আছে। দিনটা বোধ হয় শনিবার। মেসের অধিকাংশ বাসিন্দাই কেরাণী। কাছাকাছি মফস্বলে তাঁদের বাড়ী। ছদিন কলকাতার চাকরী করে বেশীর ভাগই শনিবার বিকালের ট্রেণে বাড়িতে যান একদিনের ছুটি উপভোগ করতে। শনিবার রাত্রে মেস তাই একেবারে ফাঁকাই হয়ে যায়।

আমার যিনি রুম মেট ছিলেন, তিনিও সেদিন বাড়ি গেছেন। ঘরে আমি একা। মেসে দু'চারজন যাঁরা ছিলেন তাঁরাও অনেক আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছেন। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। মেসের চিরন্তন ভাঙা তক্তপোষে বসে হ্যারিকেনের আলোয় কি একটা ইংরাজি উপন্যাস পড়ছিলাম ঠিক মনে নেই। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এল। জানালা দিয়ে ঘরে বৃষ্টির ছাট আসছে দেখে, জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি একটা চার ভাঁজ করা পোষ্ট-কার্ড জানলার পাল্লা খোলা রাখবার জন্যে কোণে আটকান আছে। জানালাটা বন্ধ করে নেহাৎ অলস কৌতূহল ভরেই ভাঁজ করা পোষ্টকার্ডটা খুলে একবার দেখলাম। পরের চিঠি পড়া যে উচিত নয়, বিবেকের সে নিষেধে বিশেষ যে কাণ দিইনি তা স্বীকার করছি।

পুরাণো মাস দু'এক আগেকার চিঠি। গোপনীয় বা অসাধারণ কোন কিছুই তার মধ্যে নেই। সাধারণ গরীব কেরাণীর বাড়ির খবরা খবর, তারই সঙ্গে দুএকটা ফাই ফরমাজ। গ্রামের কোন পিসিমা কলকাতার কোন চাকুরে ভাইপোকে শনিবার বাড়ি যাবার সময়, কি

কি নিয়ে যেতে হবে তারই একটা ফর্দ্দ দিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিঠির একটি লাইন কিন্তু আমার মনে কেমন দাগ দিয়ে গেল। পিসিমা লিখেছেন—"বউমার আজো জ্বর এসেছে। দেখতে দেখতে ত দুমাস হয়ে গেল। ঘুষঘুষে জ্বর ত কিছুতেই যাচ্ছে না। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো কোন ডাক্তারকে একবার দেখালে হয় না ?

ঠিকানার লেখা নামটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চিঠিটা কাকে লেখা জানি না। কে জানে হয়ত আমার যিনি রুমমেট এ তাঁরই পিসিমার চিঠি। কে জানে হয়ত তাঁরই স্ত্রী এ চিঠি যেদিন লেখা হয়েছে সেদিন পর্য্যন্ত দু'মাস ধরে ঘুষঘুষে জ্বরে ভুগেছেন। তারপর এই দু'মাসে তিনি কেমন আছেন ? জ্বব তাঁর সেরেছে কি ? কলকাতায় কোন ভালো ডাক্তারের কাছে এনে সত্যিই তাঁকে দেখান হয়েছে কি ? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর আমি পাব না। চিঠিটা আমার রুম মেটেরই যদি হয় তবু সোমবার তিনি ফিরে এলে তাঁর চিঠি গোপনে দেখে ফেলেছি স্বীকার করে এসব কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে কিছুতেই পাবব না।

বাইরে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পডছে। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত আমার মেসের ঘর থেকে একটি নিরুত্তর সকরুণ প্রশ্ন আমার অনেক দূরে আর একটি দরিদ্র গ্রাম্য সংসারে তখন নিয়ে গেছে। সেখানে শীর্ণ রোগ জীর্ণ একটি বালিকা বধূ শয্যার সঙ্গে মিলিয়ে শুয়ে আছে। উদ্বিগ্ন স্বামী তার শিয়রে বসে তাকে খুশী করে তোলবার জন্যে অনেক কথাই হয়ত বলে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটির বুঝি সেদিকে তেমন কান নেই। শনিবারের পর রবিবার, তার পরেই সোমবার সকালের বিদায়ের ক্ষণটি ভেবেই সে হয়ত কাতর। আবার তারপর কি সুদীর্ঘ ব্যবধান। রোগ শয্যায় প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত প্রত্যেকটি ঘণ্টা যেন অসীম শ্রান্তিতে আরো দীর্ঘ হয়ে ওঠে। এক একটি দিন যেন এক একটি যুগ। এই যুগ পার হয়ে আর যদি দেখা না হয়।

অনেক প্রেমের গল্পই এ পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে হিলিওট্রোপ রঙের শাড়ি পরে রডোডেনড্রন গাছের তলায় যারা অনুরাগের রঙীন খেলা খেলে, তাদের কথা যেন আমার কাছে বিশ্বাস হয়ে গেল।

মনে হল রাঙা মাটির পাহাড়ী দেশে বিবাগী হয়ে ইউক্যালিপ্টাস গাছের তলায় বসে যারা বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের বেদনা নেহাৎ জোলো।

কিছু যাদের নেই,—যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ক্যাকাশে জীবনের কোন গল্প কি হতে পারে না? হোক্ বা না হোক্ তাদের কথাই লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লিখলাম শুধু এক কেরাণীর গল্প। সেই গল্পের নামই 'শুধু কেরাণী'।

সেই রাত্রেই গল্পটি লিখে ফেলে পরের দিন সকালে ঝোঁকের মাথায় একেবারে প্রবাসী কাগজে পাঠিয়ে দিলাম।

মনে মনে জানতাম ব্যাপারটা ওইখানেই খতম। একেবারে নতুন লেখকের ওরকম গল্প 'প্রবাসী' পত্রিকায় স্থান পাবে এ তখন আশাই করতে পারিনি। বিশেষ কোন আশা বা উদ্বেগ না নিয়েই তাই ঢাকায় ফিরে গেলাম। সেখানে মাসের পর মাস যখন কেটে গেল তখন গল্পটির পরিণাম সম্বন্ধে কোন সংশয়ও আর রইল না।

প্রায় ছ'মাস বাদে একদিন কিন্তু প্রবাসী পত্রিকা খুলে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। কাগজে গল্পটি বেরিয়েছে। প্রবাসী থেকে গল্পটি যে ছাপা হবে সে রকম কোন সংবাদ হয়ত আমায় আগেই পাঠান হয়েছিল। সে চিঠি আমি পাইনি বলেই অভাবিত বিস্ময় ও আনন্দের মাত্রা এত বেশী।

বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় ফিরে এলে বিস্ময় ও আনন্দ আরো বেড়ে গেল। আমার প্রথম প্রকাশিত গল্পটি নিয়ে কল্লোল কাগজে বেশ দীর্ঘ একটি সুখ্যাতি মূলক সমালোচনা বেরিয়েছে। 'কল্লোলের' এই সমর্থনের মূল্য যে আমার সাহিত্যিক জীবনে কতখানি তার পরিমাণ হয় না! অজ্ঞাত অখ্যাত একজন লেখককে এভাবে প্রথম আত্ম-প্রকাশে উৎসাহ দেবার উদারতা আজকাল কোথাও দেখতে পাই বলে মনে হয় না। সাহিত্য-জীবন সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করব কিনা এবিষয়ে মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল কল্লোলের দলের সংস্পর্শে এসে তা এক নিমেষে কেটে গেল।

কলকাতার একটি ছোট্ট গলিতে ছোট্ট একটি বাড়ির নিতান্ত অপরিসর

একটি বৈঠক খানার ঘরে তখন কল্লোলের বৈঠক বসে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ধরা বৈঠক সে নয়। সে বৈঠক দিনে রাত্রে সব সময়েই খোলা। যখনই গিয়ে হাজির হও কেউ না কেউ আসর জাঁকিয়ে বসে আছেই। এখনকার বাংলা সাহিত্যে যাঁদের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁদের অনেকেই সেই ছোট্ট ঘরের ছোট্ট তক্তাপোষে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে একদিন বসেছেন। আকারে, উপকরণে, সঙ্গীতে কল্লোল তখন ছোট বটে কিন্তু আশায় উৎসাহে স্বপ্নে নয়। শুধু একটা কাগজের অফিস বলে সেই ঘরটিকে আমরা কোনদিনই ভাবতে পারিনি। আমাদের কাছে সেই ঘরটাই ছিল একটা অভিযানের প্রতীক।

কল্লোলের মারফৎ যাঁদের সঙ্গে পরিচয় প্রধানত তাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণাতেই নূতন করে আমার জীবনে লেখার জোয়ার এসেছিল।

আমার প্রথম ছাপান গল্পে তখনকার প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে ক্ষীণ একটু বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলাম বল্লে খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হয়। বোধ হয় যাদের কথা কেউ লেখে না, যাদের জীবনে চোখ ধাঁধানর ছড়াছড়ি নেই, তাদের কথা লেখবার একটা তাগিদ এ গল্পের অনেক আগেই আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন ছিল। 'শুধু কেরাণীর' অনেক আগেই আমাব 'পাঁক' উপন্যাসটি লিখতে সুরু করেছিলাম। এখনকার মত কোন 'ইজমের' প্রগতি সাহিত্যিক হবার বাতিক তখন দেখা দেযনি। এখন যা ক্যাসান, তখন তাই বিদ্রোহের অপরাধ ছিল বল্লে মিথ্যা বলা হয় না। বামুনের পৈতের মত এখন যে অধম তারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তারই চিহ্ন গায়ে থাকলে সাহিত্যিক একঘরে হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এ বিপদ অগ্রাহ্য করেই নেহাত ভেতরেব তাগিদে শৈলজানন্দ সেদিন তাঁর কয়লা কুঠির গল্প, অচিন্ত্য কুমার তাঁর বেদে লিখেছিলেন।

আমার প্রথম গল্পের কাহিনী যথাসাধ্য বলবার চেষ্টা করলাম। খুঁটি নাটির একটু আধটু তফাৎ ছাড়া এ গল্প আর সব সাহিত্যিকের প্রথম গল্পের কাহিনীর মতই পুরাণো মনে হলেই আমি খুশী।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

২১শে জুলাই, ১৯৪৫

ছেলেবেলা থেকেই গল্পের দিকে ঝোঁক আমার বেশী। যখন সবে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছি তখনই বর্দ্ধমানের মহারাজার সম্পাদিত বিরাট গদ্য মহাভারত বানান ক'রে ক'রে প'ড়ে অর্থাৎ তাথেকে গল্পটা ছেঁকে নেবার চেষ্টা করি। এর সঙ্গে চলেছিল অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'মহানিশা'—যা তখনকার মাসিকপত্রে বেরোচ্ছে। তার সবটা ভালো লাগেনি, বা সবটা বুঝিওনি—শুধু স্থানে স্থানে হাস্যরসাত্মক চিত্রগুলি মনে দাগ কেটেছিল, এমনকি তার দু'চারটা লাইনও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এরপরে এধারের পড়ার সঙ্গে তাল রেখেই নাটক নভেল পড়া চললো, মা দাদারা যে বইই আনুন না কেন সময় পেলেই তা আমি পড়বার চেষ্টা করবই। বুঝি আর না বুঝি।

কিন্তু নেশাটা শুধু গল্প পড়বার বা শোনবারই নয়, গল্প বলবারও বটে। খুব যখন ছোট তখন আর কোথায় শ্রোতা পাব বলুন, নির্জ্জনে বারান্দার রেলিংগুলোকে শ্রোতা ঠাউরে অনর্গল গল্প বলে যেতুম বানিয়ে বানিয়ে। মজা হচ্ছে এই, যে সব গল্প ইতিমধ্যে পড়েছি বা শুনেছি, বলবার সময় সেইগুলোই আত্মসাৎ করতুম বটে কিন্তু আমি যখন বলতুম তখন সেইসব বিশেষ ঘটনার নায়ক থাকতুম একমাত্র আমি। অর্থাৎ আমিই যুদ্ধ করতুম কৌরবদের সঙ্গে, আমিই সুভদ্রাহরণ করতুম। আমিই গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করতুম, আমি ভায়ের দ্বারা প্রতারিত হয়ে সর্ব্বস্বান্ত হতুম। আমিই সিন্দবাদ নাবিকরূপে বাণিজ্য যাত্রা করতুম, আমিই উত্তরাপথ থেকে নরওয়ে পর্যন্ত ভ্রমণ করে

বেড়াতুম। শুধু যে নায়ক বদল হত তাই নয়, আমার কল্পনা শক্তি তখনই কিছু কিছু কাজ করত, ঘটনাটা ঠিক যেমনটি বই-এ পড়েছি, তেমনি না ঘটে ইচ্ছামত বদলে যেত।

এমনি করে গল্প বলতে বলতেই ক্রমশ আমার সৃষ্টি করবার ক্ষমতাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। ঘরের আবেষ্টনী ছাড়িয়ে যখন ইস্কুলে পডতে গেলুম তখন অদ্ভুত একটা ব্যাপারে আমার শ্রোতারা জড় রেলিং থেকে জীবন্ত মানুষে পরিণত হ'লো। ছেলেবেলায় আমি কাশীতে ছিলুম। সেখানকার যে ইস্কুলে পডতুম সেখানে তখন মাসে বোধ হয় দিন তিনেক ক্লাস টিচাররাই মাইনে নিতেন। ফলে শেষের দিন এমন ভীড হ'ত যে সেদিন পড়াশুনা কিছুই চল'ত না; সারা ঘণ্টা এমন কি ঘণ্টার পরও ক্লাস টিচারকে মাইনে নিতে হতো। এই সময়টা হট্টগোল হ'ত ভীষণ, এক একসময়ে গোলমালে ঠিক হিসেব রাখাই শক্ত হ'ত। এমনি একটা বিপদে পড়ে একদিন মাষ্টার মশায় হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই তোরা কেউ একটা গল্প বলতে পারবি? অনেক ত বই পডিস লাইব্রেরী থেকে—তারই একটা গল্প বল না।' বলা বাহুল্য আমিই উঠলুম লাফিয়ে—। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় দীনেন্দ্র কুমার রায়ের রহস্য লহরী সিরিজ বেরোতে আরম্ভ করেছে, আর তার অনেকগুলিই তখন পড়ে শেষ করেছি। ওঁরই অনুবাদিত বড আরব্য উপন্যাসও মায়ের আলমারী থেকে চুরি করে পড়েছি—আর আমায় পায় কে! রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে বদরুদ্দীনকে মিশিয়ে অপূর্ব্ব এক জগাখিচুড়ি পরিবেশন করতে শুরু করলুম। হয়ত কোন একটা বইএর গল্পই বলছি। কিন্তু তেমন জমছে না। মানে সবাই চুপ করে শুনছে না। তখন দিলুম সে গল্প ইচ্ছামত বদলে। কী রকম ভাবে ঘটনার মোড ফেরালে আমার সহপাঠীরা খুশী হবে সে জ্ঞান ইতিমধ্যেই খানিকটা হয়েছিল। সুতরাং কোন অসুবিধা হত না—গল্প বেশ জমে উঠত।

এইভাবে দুচার দিন চলবার পর যখন সাহস বেড়ে গেল তখন সুরু করলাম স্বাধীন গল্প বলতে। সহপাঠীরা চায় রহস্যলহরী অর্থাৎ রবার্ট ব্লেকের গল্প, আমিও রবার্ট ব্লেককে নায়ক ক'রেই যথেচ্ছ গল্প

বলতুম। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, ইন্স্পেক্টার কট্‌স্—বেকারষ্ট্রীট, পিকাডেলী প্রভৃতি নামগুলো আয়ত্ত হ'য়ে গিয়েছিল এর মধ্যে, সুতরাং বিশেষ কোন অসুবিধা হ'ত না। একটি কথা তখনই বুঝতে পেরেছিলুম যে আমার স্বাধীন রচনা তাদের শোনাচ্ছি একথা বললে তাদের একটুও শ্রদ্ধা থাকবে না; শুনবেও না; তাই আমার অদৃষ্টে সবটাই গেল উল্টো—পরের গল্প নিজের বলে না চালিয়ে নিজের গল্পই অনেক সময়ে পরের বলে চালাতে হ'ত!

এমনি করে রচনা শক্তি ধীরে ধীরে বাড়ছিল মুখে মুখে গল্প বলেই বটে কিন্তু তাই বলে কলমধরা বন্ধ ছিল না। একটা কথা আমি জোর করেই বলতে পারি, আপনারা অহঙ্কার বলে মনে করবেন বোধ হয়, কিন্তু খুব সম্ভব এটা সত্য—পৃথিবীর সব লেখকই প্রথমে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন অন্তত যতদূর জানা আছে, তারমধ্যে সবাই। কিন্তু আমার প্রথম রচনা গদ্য আর সেটা গল্প! দু'টো-তিনটে-পাঁচটা করে লাইন লিখবার চেষ্টা করেছি বহুদিন থেকেই, বোধহয় বছর আষ্টেক বয়সের সময়—সম্পূর্ণ গল্প একটি লিখি দশ বছর পেরিয়ে এগারোর কোঠায় পা দিয়ে। গল্পটার নাম মনে আছে, 'অভয় কুসুম'—অভয় নামক একটি বালকের সঙ্গে কুসুম নাম্নী একটি মেয়ের কিছু প্রণয় ছিল। এরা ছিল তার প্রতিবেশী—কিন্তু সামান্য কি একটা কারণে অভয় দেশত্যাগী হ'ল—কুসুম তার আশাপথ চেয়ে থেকে থেকে কঠিন অসুখে পড়ল, অভয় যখন ফিরল তখন সে মৃত্যু শয্যায়। অর্থাৎ রীতিমত হতাশ প্রণয়ের উপাখ্যান। এর পরে যে রচনাটি সম্পূর্ণ করি সেটি গল্প হ'লেও ছন্দে গাঁথা। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে 'ঝালোয়ার সর্দার' নাম দিয়ে কবিতাটি লেখা হয়েছিল—। কি যে লিখেছিলুম তা আজ আর বলতে পারব না তবে সেটা যে সদ্য রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' এবং যজ্ঞেশ্বর বাবুর টডের রাজস্থান পড়ার ফল তা বেশ মনে আছে। বলা বাহুল্য এসব কোন রচনাই নরলোকে প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু লিখতে যখন সুরু করেছি তখন তা প্রকাশিত হওয়া চাই—অর্থাৎ দু'চারজন পড়া চাই। নইলে মন খুশী হয় না। খুব ছোট

বেলাতেই, বোধ হয় তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, সখ হল মাসিক প'ত্র বের করব। সে চেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল। ক্লাস সিক্স্-এ উঠে ইস্কুল বদল হ'ল—বেশ উৎসাহী বন্ধুও পেলুম—প্রথম মাসিক পত্র বেরোল। সে মাসিক পত্রের নামটা আজ আর মনে নেই—আমিও আমার আর দুটি বন্ধু তার সম্পাদক ছিলুম। প্রথম প্রথম বন্ধুরা অনেকে লিখে-ছিলেন (অবশ্য তার মধ্যে অনেক লেখাই ছিল, না বলিয়া পরের লেখা গ্রহণ) কিন্তু আমিই যে তার বেশীর ভাগ লেখা লিখেছিলুম সেটা আজও মনে আছে—একটা উপন্যাসও সুরু হয়েছিল রবার্ট ব্লেকের অনুসরণে যদিও সেটা শেষ হয়নি কোন দিনই।

এই হাতে লেখা মাসিকপত্র বার করার উৎসাহ বহুদিন ছিল। রচনা যা ছাইভস্ম হ'ত তা বুঝতেই পারছেন! তবু লেখার বিরাম ছিল না, আর তা পাঁচজনকে দেখিয়ে বাহাদুরী নেওয়াও চাই। স্কুল বদল হ'ল, কাশী থেকে কলকাতা এলুম—এখানেও সে নেশা কাটল না। ইস্কুলে ওপরের দিকে একটা মাসিক ছিল কিন্তু তারা আমাদের গ্রাহ্য করবে কেন? তাই নিজেদের ক্লাস থেকে একখানা মাসিক পত্র বার করা হবে স্থির হ'ল আর সে সংকল্প কাযে পরিণত হতেও দেরী হ'ল না। সে কাগজের নাম ছিল হিমালয়, আমি এবং আমার সহপাঠী-বন্ধু, প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক সুমথ নাথ ঘোষ, ছিলুম তার সম্পাদক।

এর মধ্যে দু'একবার চুপি চুপি ছেলেদের ছাপা মাসিক পত্রের অফিসে গল্প ফেলে দিয়ে আসার চেষ্টাও চলেছে। একবার যাঁকে ভার দিয়েছিলুম পরে শুনেছি যে তিনি সে লেখা বুদ্ধিমানের মত পথেই ছিঁড়ে দিয়েছিলেন, অফিসে পৌঁছাযনি। আর একটি লেখা নিজেই ডাকে দিয়েছিলাম, বলা বাহুল্য তার কোন পাত্তা মেলেনি।

কিন্তু উৎসাহ ত কম নয়—শুধু ক্লাসের কাগজে আর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারছি না, এমনি অবস্থা। পাড়ায় বেরোলো 'শেফালি' নাম দিয়ে এক মাসিক—মহাউল্লাসে সেখানে কাজে লেগে গেলুম। এই শেফালি কাগজটি চলেছিল প্রায় ছ'সাত বছর, সাধারণত এতদিন হাতে লেখার মাসিক বার করার উৎসাহ বা উদ্যম কারুর থাকে না

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটি ভাল কর্ম্মী পেয়েছিলুম। যদিও শেষের দিকে আমরা দুটি মাত্র লোকে ঠেকেছিলুম, একটি বন্ধু সুবোধ, সে হাতে লিখত, আর একটি আমি—রচনা জোগাতুম। নামে-বেনামে সমস্ত লেখাই এবং সমস্ত রকম লেখাই আমাকে দিতে হ'ত। এমন কি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, সে সময় কবিতা পর্যন্ত লিখেছি বাধ্য হয়ে। এই শেফালির সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যে আমরা তিন বন্ধুতে মিলে আর একটি কাগজও বার করেছিলাম ' বিজয় ' নাম দিয়ে—প্রায় বছর দুই সেটাকে চালাতে হয়েছিল এবং সে ক্ষেত্রেও শেষের দিকে আমি ছাডা আর বিশেষ কোন লেখক ছিল না।

এমনি করে হাতে লেখা কাগজে বিস্তর গল্প লিখেছি। তার কোনটাই কোনদিন ছাপার মুখ দেখেনি, দেখবেও না তা জানি কিন্তু সে পরিশ্রম যে একেবারে বৃথা হয়েছে তা বলব না। প্রথমত ঐখানেই একটু একটু করে হাত পেকেছে, প্রথমে যা ছিল প্রলাপ, শেষে তাই রচনায় দাঁড়ালো। দ্বিতীয়ত ওখানে লেখার জন্যই হঠাৎ একদিন ছাপার অক্ষরে বড়দের কাগজে বেরোবার সুযোগ মিলল। কেমন করে তাই বলি—

সেটা একটা রবিবার তা মনে আছে। সন্ধ্যা তখনও ভাল করে ঘনিয়ে আসেনি, একটু আবছায়া আলো গাছের ডগায় আছে লেগে। বাড়ীর ভিতরে বসে গল্প করছি এমন সময় কার ভারী গলার ডাক কানে পৌছল 'গজেন বাবু আছেন?'

তাডাতাড়ি বেরিয়ে গেলুম। একটি দোহারা গোছের অপরিচিত ভদ্রলোক মাথায় কবি প্যাটার্নের বড় বড চুল, ডাগর চোখ। দোর খুললেই তিনি নমস্কার করে বললেন, আমাকে চিনতে পারছেন না, বোধ হয়' আমার নাম কেশব সেন।'

নামটা একটু চেষ্টা করে মনে করতে হ'ল—হ্যাঁ—আপনারই ত রাখাল রাজা নাটক, না?

তিনি বেশ খুসী হলেন। বোধ হয় তখন তিনি ভোট রঙ্গে কাজ করেন, ছেলেদের নাটক একখানা লিখেছেন রাখাল রাজা বলে, সম্প্রতি

আমাদের পাড়াতে অভিনীতও হয়েছে। হঠাৎ একজন সাহিত্যিক আমার কাছে কী জন্য এসেছেন বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলুম। তখন তিনিই কথাটা ভাঙলেন। বললেন, 'দেখুন এইমাত্র লাইব্রেরীতে বসে বসে আপনাদের শেফালি পড়ছিলুম। আপনার একটা গল্প পড়লুম—ভারী ভাল লাগল। তা আমাকে একটা গল্প দিন না।

ভাবলুম যে তিনিও হয়ত হাতে লেখা কাগজের জন্যই চাইছেন। যে লোকটা ছাপা কাগজের সম্পাদনা করে তার আবার এ উদ্ভট সখ কেন রে বাবা! বেশ একটু অবাক হলুম, প্রশ্ন করলুম, 'আপনি কী করেন? কোন কাগজের জন্য?'

তিনি যে জবাব দিলেন, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে কেন না সেদিন তাঁর সেই কথাতে যে গর্ব্ব বোধ করেছিলুম, পরবর্ত্তী জীবনে কোন সম্মানেই ততটা করিনি। তিনি বললেন, আমি নিজে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বার করছি "ঋত্বিক" বলে, তারই প্রথম সংখ্যায় দিতে চাই।

বুঝুন আমার মনের অবস্থাটা! একটা জলজ্যান্ত ছাপা কাগজের সম্পাদক আর একটা ছাপা কাগজের প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা চাইতে এসেছেন আমার কাছে। আমার বাড়ী বয়ে।···তারপর যে তাকে কি বলেছিলুম তা মনে নেই তবে তিনি চেয়েছিলেন গল্প তার পরের দিনই, কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি এটা বেশ মনে আছে। খুব তাড়াতাড়ি লেখা দিলে ওঁর চোখে খেলো হয়ে যাব, বোধ হয় এমনি একটা ধারণাই ছিল।

যদিও লেখা দেবার সময় এমনই নার্ভাস হয়ে গেলুম যে, দুটো গল্প লিখে দুটোই ছিঁড়ে ফেলে শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় গল্পটা যখন ভয়ে ভয়ে কেশব বাবুর হাতে দিলুম তখন আর প্রথম সংখ্যায় যাবার সময় নেই, সে গল্প ছাপা হল ঋত্বিকের দ্বিতীয় সংখ্যায়। কেশববাবু বেচারা মারা গেছেন। বহু কাগজ তিনি বার করেছিলেন। তার কোনটাই আজ আর বেঁচে নেই। কয়েকখানা ছেলেদের নাটক ছাড়া সাহিত্য-গ্রন্থও তিনি কিছু রেখে যেতে পারেন নি—কিন্তু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

এবং সাহিত্যিক চেনবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ, আজ এই কথাটাই কেবল মনে পড়ছে। তাঁর কাছে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার কারণ যথেষ্টই আছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে—তাঁর সৌজন্যেই আমি সাহিত্যিকদের পক্ষে সুদুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলুম—আমার প্রথম গল্প সম্পাদক বাড়ীতে এসে চেয়ে নিয়ে গিয়ে ছাপিয়েছিলেন।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

২৮শে জুলাই, ১৯৪৫

আজ আপনারা আমাকে বেশ একটু মুসকিলে ফেলেছেন। আমাকে আমার গল্প লেখা সম্বন্ধে আপনাদের কাছে গল্প করতে হবে। আজীবন শুধু গণিত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই করেছি, অন্য কোন দিকেই আমার সময় বা ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করি নি। মাঝে মাঝে দু একটা গল্প লেখা, যা হয়তো আপনাদের কারো চোখেই পড়েনি—এটা আমার খেয়াল। এটাকে আমার স্বাভাবিক কর্মজীবনের অঙ্গীভূত মনে করতে পারিনে।

আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন, আপনি গল্প লেখার সময় পান কখন? ভাবটা এই যে, যাঁরা গল্প লেখেন না, তাঁরা শুধু সময়ের অভাবেই গল্প লিখ্‌তে পারেন না, একটু সময় পেলেই রাশি রাশি গল্প লিখে ফেলতে পার্‌তেন। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমি যে সময়ের মধ্যে সামান্য যা কিছু লিখেছি, একটুখানি পাটিগণিতের সাহায্য নিলেই দেখ্‌তে পাই, তার পরিমাণ গড়ে সপ্তাহে পৃষ্ঠা দেড়েক মাত্র হবে। নবদম্পতীদের কথা ছেড়ে দিলেও, আপনাদের সকলেই সাধারণ চিঠিপত্র এর চেয়ে অনেক বেশি লেখেন। তাছাড়া সপ্তাহে আধ ঘণ্টা সময় খেয়ালের জন্য নষ্ট করেন না, এমন মহাপুরুষ পৃথিবীতে কয়জন আছেন জানিনে।

গল্পই হোক বা অন্য কোন প্রকার সাহিত্যই হোক, এর চর্চা দু'রকমের। একটা খেয়াল, আর একটা সাধনা। উভয়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ ও তৃপ্তি হলেও দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। বাতাবী

লেবু দিয়ে বাড়ীর উঠানে ফুটবল খেলা, আর ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে বড় বড় দুইদলের ফুটবল খেলা, দুইই খেলা, কিন্তু তার মধ্যে প্রভেদ আছে। তেমনি সাহিত্য যাঁদের জীবনের ব্রত, যাঁদের সাধনা, তাঁদের গল্প লেখা আর আমার গল্প লেখাতেও তেমনি প্রভেদ আছে। এর পেছনে কোন শ্রম নেই, কোন প্ল্যান নেই, কোন জটিলতা নেই, এক কথায়, কোন বিশিষ্ট সাধনা সেই। কাজেই সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে বোধ হয় এর তুলনা চলে না। তাই এ সম্বন্ধে বলবারও তেমন কিছু নেই।

বলবার কিছু নেই বটে, কিন্তু বিপদ আছে। যখন আমরা সপ্তাহে চোদ্দ ঘণ্টা ব্রীজ খেলি বা পনের ঘণ্টা ক্রশওয়ার্ড পাজলের সমাধান করি, বা আঠার ঘণ্টা পরনিন্দা করি, তখন কোন কথা ওঠে না, কারণ একাজগুলির প্রমাণ সংবাদপত্রে বেরোয় না। কিন্তু একঘণ্টা বসে একটা গল্প লিখে কোন পত্রিকায় যদি প্রকাশ করা যায়, তাহলে হাতে-নাতে প্রমাণ হয়ে গেল যে, লোকটা একঘণ্টা সময় বাজে কাজে নষ্ট করেছে। এই ধরুন না, আপনারা সকলেই মনে করছেন, ভদ্রলোক শুধু শুধু কয়েক মিনিট সময় নষ্ট করছেন, কিন্তু আপনারা রেডিওর পাশে বসে কে কতক্ষণ সময় নষ্ট করছেন, তা তো আর আমি জানতে পারছি নে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় খুব ঘনিষ্ট নয়। ছোট বেলায় সংস্কৃত পড়ার দিকে বেশ একটু ঝোঁক ছিল, সংস্কৃত ব্যাকরণ-টাকে ঠিক্ বিভীষিকা মনে হতো না। সম্ভবত সংস্কৃতের জ্ঞাতি বলেই বাংলাটাও মন্দ লাগতো না। তবে' সাধারণত অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা যা করে থাকে, দু'একটা কবিতা লেখা, শিক্ষক বা অধ্যাপকদের বিদায়-কালে বিদায়োপহার বা আত্মীয়-স্বজনের বিবাহের সময়ে এক আধটা প্রীতি-উপহার রচনা—এর বেশি অন্য কোন রকম সাহিত্যচর্চ্চা করবার ইচ্ছা বা অবকাশ হয় নি। তবে, অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে, অতি সাধারণ পরিচিত কাজ কর্ম ও সুখ দুঃখের মধ্যেও যে হাসির উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকতে পারে, এটা যেন অতি সহজ কথা বলেই সব সময়ে মনে হয়েছে। অনেক সময়েই এই হাসির পশ্চাতে থাকে বুকফাটা কান্না, রসিকতার আবরণের মধ্যে থাকে গভীর উদ্বেগ,

বিদ্রূপের অন্তরালে থাকে অপরিসীম দুঃখ। একবার মনে পড়ে—তখন স্কুলে পড়ি—ইন্‌স্পেক্টর এসেছিলেন স্কুল দেখতে। আমাদের ক্লাশে এলেন, এক একজন ছাত্রকে ডেকে এক একটা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু আমরা ভয়ে এবং উদ্বেগে এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম, যে কেউ কোন কথার জবাব দিতে পারলুম না। সব প্রশ্নগুলিই যে খুব কঠিন ছিল, তা নয়। অনেকগুলি প্রশ্নেরই জবাব আমাদের অনেকেরই বেশ জানা ছিল, কিন্তু কেমন যেন থতমত খেয়ে কেউ কিছু বলতে পারলুম না। ইন্‌স্পেক্টর মশাই চলে যেতেই আমরা প্রকৃতিস্থ হলুম এবং তখনই বসে রাফ্‌-খাতায় একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখে ফেললুম—উপযাতি ছন্দে। ইনস্পেক্টরকে দেখে আমরা ভয়ে আমাদের জানা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে না পেরে বেকুব হয়ে গেলাম, এই ছিল সে শ্লোকের ভাবার্থ।

আর একবার মনে পড়ে—সেও ছাত্রজীবনের কথা। বোর্ডিংএ থাকতুম। নানাপ্রকার অসুবিধা, চাকরের দুধে জল মেশানো থেকে সুরু করে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের মেজাজ পর্য্যন্ত বহুবিধ বিষয় নিয়ে তখন বেশ আন্দোলন চলেছে। এই অবস্থাটাকে অবলম্বন করে একটা ছড়া লিখেছিলুম—বেশ বড় একটা ছড়া—এখন হয়তো সেটা খুঁজেই পাব না। যত দূর মনে পড়ে তার প্রথম লাইন ছিল 'বোর্ডিংএ সুখ নাইরে, এইতো কথা স্থূল'। এই ছড়া শুনে বোর্ডিং-বাসীরা অনেক দুঃখের মধ্যেও হাসি সংবরণ করতে পারেন নি। অথচ এ ছড়াটার সব টুকুই ছিল অভিযোগ ভরা, বেদনায় ভরা।

আমি গল্প ঠিক কবে প্রথম লিখেছিলাম, তা মনে মনে করতে পারছি নে। আমার গল্পগুলো গল্পের ডেফিনিশন অনুসারে গল্প কি না, সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। ছোট গল্প ছোট হবে, একটা বিশেষ ঘটনা তার লক্ষ্য থাকবে, পড়তে আরম্ভ করলে গল্পের শেষে কি হবে তা মোটেই বোঝা যাবে না, গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা ঔৎসুক্য, একটা প্রতীক্ষা মনকে অভিভূত করে রাখবে, শেষে কি হ'ল জানবার জন্য মন আকুলি বিকুলি করবে, এবং যেই আসল ঘটনাটা ঘটে যাবে, অমনি গল্প লেখা শেষ হবে, তার পরে আর একটি লাইনও লেখা চলবে না, লিখলে

রসভঙ্গ হবে, গল্পের গল্পত্ব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে। এই সব সাহিত্যিক মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে আমার লেখাগুলিকে গল্প বলা সঙ্গত হবে কিনা তা জানিনে।

এই সব টেকনিক ছাড়াও ছোট গল্পের লেখক ও পাঠক উভয়েরই একটা মস্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়। ছোট গল্প ছোট রেখা-চিত্রের মত—গল্পের একটা আভাষমাত্র দেয়। এটাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হয় নিজের কল্পনা দিয়ে। ছেলেদের ড্রয়িং বুকে একটা লাইন দিয়ে আঁকা ফুল—সেটা শুধু ফুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার পাপড়ি তার চারিপাশের পাতা, তার রূপ, তার গন্ধ, সবই মনে মনে কল্পনা করে নিতে হয় তা না পারলে ঐ ছবি দেখার কোন মূল্য থাকে না। রং দিয়ে আঁকা শিল্পীর ছবিতে গন্ধ ছাড়া প্রায় আর সবই থাকে—ফুলটার স্বরূপ আপনাআপনি চোখের উপর এসে পড়ে, কষ্ট কল্পনা করতে হয় না। তেমনি বড় উপন্যাস বা গল্পে ঘটনা ও চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকে বলে তা থেকে রসগ্রহণ করতে বেশি কল্পনার দরকার হয় না। কিন্তু ছোট গল্পের ছোট-কাঠামোর মধ্য থেকে রস পেতে হলে, মনে মনে সেই কাঠামোর গায়ে কল্পনার তুলি দিয়ে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করে নিতে হয়। ছোট গল্প যে লেখে, তার মনের কল্পনাটিকে ভাল করে রূপ দিতে না পেরে তার মন থেকে যায় অতৃপ্ত, যে পড়ে, সেও যদি কল্পনা প্রবণ না হয়, তাহলে তার কাছেও ছোট গল্প হয়ে পড়ে রসহীন। অল্প কথার মধ্যে অনেকখানি কল্পনা বেঁধে ফেলা যেমন কঠিন, অল্প কথায় গাঁথা গল্পের ভিতর থেকে তার সম্পূর্ণ চিত্রটিকে কল্পনা করাও তেমনি কঠিন। সেইজন্যই সর্বদা আমার মনে সংশয় থেকে যায়, খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে যা লিখি তা হয়তো গল্পই হয় না' হয়তো পাঠকের মনই স্পর্শ করে না।

গল্প যাঁরা লিখতে পারেন, তাঁদের উপাদানের অভাব হয় না, ছোট গল্পের জন্য প্রকাণ্ড একটা ব্যাপার, অদ্ভুত একটা ব্যক্তি, আশ্চর্য একটা ঘটনা, এসবের কোন প্রয়োজন নেই। অতি সাধারণ পরিবেশ অতি সাধারণ ব্যক্তি ও অতি সাধারণ কাজ নিয়েও বেশ গল্প লেখা

যেতে পারে, যদি লেখকের মনে কল্পনার রং ধরে, যদি তার কল্পনা আত্মপ্রকাশ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই তো দিনের শেষে কাজকর্ম সেরে বসে আছি গঙ্গার তীরে, সবুজ ঘাসের উপরে। শান্ত প্রকৃতি, শান্ত আকাশ, শান্ত ধরণী। সামনে চেয়ে আছে সূর্যমুখী ফুলগুলি ম্লানমুখে, ওদের দয়িত অস্তে গেছে। নিস্তব্ধ খেজুর গাছের পাতাগুলি ছড়িয়ে আছে চিরুণীর মত, অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলি কাঁপছে তর্‌তর্‌ করে, ওরই নীচে বসে বসে রোমন্থন করছে গাভীগুলি। সামনে বয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী, তার বিস্তৃত জলরাশির উপর দিয়ে বয়ে আসছে মৃদু মধুর সমীরণ, লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ঢেউ খেলছে তার প্রশান্ত বুকে। পশ্চিম আকাশের লাল রং ছড়িয়ে পড়েছে ওর বুকে—ওপারের গাছ পালা বাড়ী ঘর ওকে যেন জড়িয়ে আছে পরম আদরে।

এই শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির ছবিখানি দেখবার, উপভোগ করবার, ধ্যান করবার, স্বপ্ন দেখবার মুগ্ধ হবার আত্মবিস্মৃত হবার—কিন্তু গল্প করবার মত তো নয়। শুধু চুপ করে বসে এতে ডুবে থাকতে পারলেই তো হ'তো ভাল। কিন্তু ঐ যে সামনে একখানি ছোট নৌকা, ছোট একখানি পাল তুলে দুলে দুলে চলেছে, নৌকার তলায় কুলু কুলু শব্দ করে ছোট ছোট ঢেউগুলি নেচে নেচে ঢলে পড়ছে, ঐ ছবিটাই তো আমার ধ্যান ভেঙে দিল। দেখলাম চেয়ে নৌকার সামনে সতরঞ্চি পেতে বসে আছে দুটি প্রাণী, একটি বৃদ্ধ একটি তরুণ। ওরা কারা, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কি ভাবছে, কি বলছে, তা আপনারা জানেন না, কিন্তু যাঁর কল্পনা আছে, তিনি তাঁর কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলবেন ঐ দুইটি প্রাণীর জীবনেতিহাস। হয়তো ওরা বাঞ্ছিত কর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে সমাধা করে প্রফুল্ল মনে বাড়ী ফিরছে, ভাগীরথীর মন্দ মধুর হাওয়ায় প্রাণ মন শীতল করে ওদের একটা গভীর সুখের অনুভূতিতে ডুবিয়ে রেখেছে। আবার হয়ত এও হতে পারে, ওদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা গেছে ব্যর্থ হয়ে, গেছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে। গভীর নৈরাশ্য ও দুঃখের বোঝা নিয়ে ফিরে চলেছে

নিজ বাসভূমে, ভাগীরথীর পুণ্য বারি বা মধুর সমীরণ ওদের দেহ মন স্পর্শ করতে পারছে না, সান্ত্বনা দিতে পারছে না। কে জানে কোন রহস্যময় গল্পের নায়ক ওরা।

আবার মনে করুন, চলেছি আমরা ভ্রমণে, দূরগামী ট্রেনে উঠে বসেছি অতি কষ্টে। ভিড়ের চাপে পিষ্ট হচ্ছি, জিনিসপত্র সামলাতে গলদঘর্ম্ম হচ্ছি। ট্রেনের কামরায় কতদেশের কতলোক, নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ। সকলেই আমরা যাচ্ছি, কেহ দূরে, কেহ নিকটে, কেহ একা, কেহ সপরিবারে। একই ট্রেনের একই কামরায় চলেছি। দুই পাশে সকলে একই দৃশ্য দেখছি। বড় বড় মাঠ, ছোট বড় কত গাছ, তারের থামের সারি, বেগে সরে যাচ্ছে পিছনে, আবার নূতন মাঠ, নূতন বন, নূতন বাড়ী ঘর ভেসে উঠছে চোখের সামনে, পর মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যাচ্ছে ট্রেণের অন্তরালে। ওইতো লাইনের পাশে ছোট্ট পুকুরের ছোট্ট মাঠে বসে বাসন মাজছে গাঁয়ের বউ-ঝিরা, ওইতো মাঠের আলের উপর দিয়ে লাঙ্গল কাঁধে চলেছে চাষীরা। সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠছে চোখের সামনে কত দৃশ্য, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। গাড়ী আসছে ষ্টেশনের কাছে, চট্-চটাং-চট শব্দে লাইন বদলাচ্ছে, একটু একটু করে গতি কমছে, ক্রমে ক্রমে প্ল্যাটফর্মে এসে গাড়ী দাঁড়াচ্ছে। চা জলখাবারের চীৎকার শোনা যাচ্ছে, কত গাড়ীর কত যাত্রী জানালায় বসে হাত বাড়িয়ে কেনা-কাটা করছে। ওই কোণ থেকে একটা বুড়ো তার পুটুলিটা নিয়ে নেমে পড়ল। আবার একটা সুটকেশ হাতে, পিছনে কুলির মাথায় বিছানা চাপিয়ে উঠল এক পশ্চিমের যাত্রী। স্থান না থাকলেও স্থান দিতে হবে তাকে। বসতে না পারলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যাবে সে। হয়তো আমারই হাটুতে একটা বিষম ধাক্কা মেরে তার সুটকেশটা রেখে দিল মেঝেতে, চাপাল তারপরে তার বিছানা।

আর সেই বিছানার উপর সে বসল বেশ কায়েমী হয়ে। গার্ডের হুইস্‌ল শোনা গেল, সবুজ নিশান দেখা গেল, ইঞ্জিনের সামনে সিগন্যাল কাত হয়ে পড়ল, ইঞ্জিন হুস হুস করে উঠল, গাড়ী নড়ে উঠল। সামনের

বেঞ্চির ছোট ছেলেটা অন্যমনস্ক ছিল, তার মাথা ঠুকে গেল গাড়ীর জানালার সঙ্গে। ষ্টেশনে থামতে যাত্রীদের যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল, আস্তে আস্তে থেমে গেল। সবাই যে যার জায়গায় স্থির হয়ে বসল। বাঁদিকের বেঞ্চির মাঝখানে সাহেবী পোষাক পরা যে ভদ্রলোকটি বসে আছেন, তাঁর হাতে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র, মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। পাশে এক ভদ্রলোক কাগজখানার উল্টাপিঠে চোখ বুলাচ্ছেন। ও পাশের মারোয়াড়ী ভদ্রলোক ঘটি থেকে খানিকটা জল আলগোছে গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুললেন। ডানদিকের বেঞ্চের মাঝখানে বসে একটি বউ,বোধ হয় বাঙালী, হঠাৎ জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ রগড়াতে আরম্ভ করল, একটা ছোট কয়লার কুচি ঢুকেছে তার ডান চোখে। কিছুতেই বেরুচ্ছে না। গাল বেয়ে টস টস করে জল গড়াচ্ছে, স্বামী বেচারী পাশে বসে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করছে কুচিটা বেরুল কি না। অত লোকের মাঝে বেশি কিছু করতেও পারছে না, বলতেও পারছে না, অথচ ব্যস্ত হচ্ছে খুবই। ব্যাপার দেখে সামনের বেঞ্চির একটি বর্ষীয়সী মহিলা বউটির মুখ খানি তুলে ধরে চোখের পাতা দুটো ফাঁক করে ধরে আঁচলের কোণটা পাকিয়ে নিয়ে অতি কষ্টে চোখটা পরিষ্কার করে দিলেন। বউটি সুস্থ হ'ল স্বামীটি আশ্বস্ত হ'ল। আমার পাশে বসেছিল একটি আধবুড়ো পশ্চিমদেশী লোক, বোধ হয় শরীরটা তেমন ভাল নয়। গাড়ীর ঝাঁকানীতে তার পেল ঘুম, অথচ একটু কাত হবার স্থান নেই। হঠাৎ দেখি তার মাথাটা এসে ঝুঁকে পড়ল আমারই কাঁধের উপর, তার মাথার রুক্ষ চুলগুলো আমার গালে শুড়শুড়ি দিতে লাগল। আস্তে সরিয়ে দিলুম, সোজা হয়ে বসল, আবার একটু পরে তার মাথাটা ঠুকে গেল আমার মাথায়। 'উঃ বলে আবার সরিয়ে দিলুম। তারপর সে অতি কষ্টে একটা হাত গাড়ীর দেওয়ালের গায়ে রেখে, তারই উপরে মাথা রেখে হাঁ করে ঘুমুতে লাগল, মাঝে মাঝে নাকডাকার শব্দও শোনা যেতে লাগল। হঠাৎ এক কোণ থেকে একটি শিশু ঘুম থেকে জেগে উঠে শুরু করল কান্না, কারো প্রবোধ মানে না। শেষে শিশুটিকে তার

বাবার কোলে রেখে মা একটা ঝুড়ি থেকে বের করলেন একটি ছোট স্পিরিট-ষ্টোভ। খবরের কাগজ মোড়া একটা শিশি থেকে একটু স্পিরিট ঢেলে, দেশলাই জ্বেলে ধরান হ'ল ষ্টোভ। একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের প্যানে করে একটু জল গরম করে একটি কৌটা থেকে তিন চামচে গুঁড়ো দুধ বের করে, জলে গুলে নেওয়া হল। ঝাঁপি থেকে বেরুল একটা পিতলের ঝিনুক। মা খুকুকে কোলে নিয়ে ঝিনুকে করে গ্লাকসো খাইয়ে দিতেই খুকুর কান্না বন্ধ হ'ল। গাড়ীর লোকের কাণগুলো সোয়াস্তি পেল। পাশের বর্ষীয়সী মহিলাটি একটি ঝাঁকার ভিতর থেকে বের করলেন পানের বাটা। অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে সাজলেন পাঁচ ছয়টা পান। নিজে খেলেন তিনটে।

আর একটা তুলে ধরলেন পাশের খুকীর মার সামনে, 'নাও বাছা একটা পান খাও'। আর একটি দিলেন ওই চোখে কয়লার-গুঁড়ো-খাওয়া বউটিকে তার পরে আর একটি পুরে দিলেন নিজের মুখেই। বাঁদিকের বেঞ্চিতে বসে একটি বেহারী, বাড়ী বোধ হয় মজঃফরপুর, বাঁহাতের তালুতে খৈনী ডলে হাতের উপরে তিনটে তাল দিয়ে, খৈনীটুকু পুরে দিল ঠোঁটের তলায়, ঠোঁটটা ফুলে উঠল পটোলের দোলমার মত। সাহেবী-পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির কাগজ পড়া হয়ে গেছে। কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে, পকেট থেকে বের করলেন সিগারেটের কৌটা। সিগারেট ধরিয়ে বেশ আরামে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। ধোঁয়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল পাশের যাত্রীদের নাকে মুখে।

গাড়ী চলেছে, ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে। সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রি হ'ল। রাত্রি বাড়তে লাগল। দশ বারো খানা পৃথক পৃথক দোতলা তেতলা বাড়ীতে যারা কোনরকমে বাস করতো, তারাই এই একখানি ট্রেনের কামরায় সকলে মিলে মোটের উপর আরামেই যাচ্ছে—এটা একটা যেন ম্যাজিকের খেলা। একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামতে, প্রায় সকলেই কিছু না কিছু খাবার কিনে খেয়ে নিলেন রাত্রির মত। খেলেন না কিছু শুধু বর্ষীয়সী মহিলাটি। তিনি তাঁর পানের বাটা খুলে আবার গোটা চারেক পান পুরে দিলেন মুখে। গাড়ী আবার ছাড়ল। রাত্রি

বাড়ল। সবারই চোখ ঘুমে ভারী হয়ে এল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে পৌঁছুতেই ঘুমের যাদু প্রায় অচেতন করে ফেলল সব যাত্রীদের। শুরু হ'ল ঢলে পড়া। পাশাপাশি যারা বসেছিলেন, সবাই ডানদিকে, বাঁদিকে, এ ওর গায়ে, কাঁধে, ঢলে পড়তে লাগলেন। কেউ পাদুটো যথা সম্ভব ছড়িয়ে দিলেন বেঞ্চির নীচে, কেউ ডান হাতখানা ছড়িয়ে দিলেন পাশের লোকটির বুকের উপরে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ হয়ে পড়লেন অর্ধ অচেতন। শুধু মাঝে মাঝে বউরা আর মেয়েরা সচকিত হযে তাঁদের হাত পা, শাড়ী ব্লাউজ সংবৃত করে নিতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'ল। সকলে আবার সচেতন হ'লেন। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে পরস্পরের প্রতি যে বেয়াদবি করেছিলেন, তার জন্য সবাই সবাইয়ের কাছে মনে মনে মাপ চাইলেন। গাড়ী থামল মোগলসরাইএ। শুরু হ'ল দাতন করা আর চা খাওযা। নেমে গেলেন বর্ষীয়সী ভক্তিমতী উপবাস-ক্লিষ্টা মহিলাটি আর তার সঙ্গে সেই চোখে-কয়লার-গুঁড়ো-পড়া বউটি ও তার স্বামী। গাড়ী যখন ছাড়ল, প্লাটফরমের এক কোণ থেকে বউটার ফুঁপিয়ে কান্না শোনা গেল, 'এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে তোমরা ?' এ আবার কি ? মোগলসরাই ষ্টেশনের কোণে দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরতা ঐ বৌটি আবার কোন গল্পের নায়িকা কে জানে! দেখে শুনে কবির কথা অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে হয—গল্পের ফাঁদ পাতা ভুবনে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৫

আমার গল্প লেখার ইতিহাস বলব। কিন্তু কী ইতিহাস বলব? পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন নিজের বিচিত্র স্বপ্নাতুর কৈশোর জীবনটাকে দেখতে পাই, তখন গল্প লেখার ব্যাপারটা নিজের কাছেই যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময়কর মনে হয়।

বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। আজ নয়, ত্রিশ থেকে বিশ বছর আগে; এবং সে সময়ে ওই সম্প্রদায়টার সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে দেবীটি আর যিনিই হোন তিনি যে সরস্বতী নন সে সম্বন্ধে বোধ হয় সাক্ষী প্রমাণ দরকার হবে না। শুনেছি সে যুগে বেশি পড়া শুনো বা ভালো ইংরেজি লেখার ক্ষমতাটা পুলিশ বিভাগে অযোগ্যতার নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হত।

কিন্তু বাবা ছিলেন আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কলেজে পড়াশুনো করে-ছিলেন। ভালো ছাত্র হিসেবে খ্যাতিও তাঁর ছিল। মনে পড়ছে ত্রিশ মাইল দূর থেকে ডাকাতের আস্তানায় রেইড করে তিনি ফিরে আসছেন—মাঠের ওপারে সাদা আরবী ঘোড়াটার ওপরে দেখা যাচ্ছে ইউনিফর্ম পরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটি পুরো পাঁচ হাত মানুষ। সহিস ছুটে এসে ঘোড়া ধরল, জিনের ওপর থেকে সোজা লাফিয়ে নামলেন মাটিতে। কপালে ঘামের বিন্দু, সারা গায়ে উত্তর বাংলার লাল ধুলো। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন: নতুন বইগুলোর ভিঃ পিঃ এসেছে?

বাবার চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। মাসে মাসে বই আসত, বাংলা

দেশের যত রকম দৈনিক সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। শুধু গ্রাহক ছিলেন না—একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন। আমাদের মতো ছোটদের জন্য আসত অধুনালুপ্ত খোকাখুকু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী। আজও আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই লোকটি কেমন করে পুলিশের চাকরীতে সুনাম অর্জন করেছিলেন! পড়াশুনো ছাড়া কোনো নেশা ছিল না, পান-তামাক অস্পৃশ্য বোধ করতেন এবং ষ্টুয়ার্ট মিল থেকে মিলটন, সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নির্ভুল উদ্ধৃতি মৃত্যুর আগেও তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু আসক্তি বা অনুরক্তি—একান্তভাবে বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। ফলে, বর্ণ পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকাল পক্কতাও অর্জন করেছিলাম কিছুটা। খোকাখুকু'র পাতায় আর মন বসত না, চুরি করে ভারতবর্ষের পাতা থেকে পড়তাম 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' (গোড়াতে বইটার ওই নামই ছিল), দেশবন্ধু দাশের 'নারায়ণ' কাগজ থেকে পড়তাম 'স্বামী'। কতটুকু বুঝতাম, ঠিক জানি না—কিন্তু আশ্চর্য দোলা লাগত মনে। এখন শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে উত্তর বাংলার একটা নগণ্য গ্রাম। আমাদের বাসার সামনে রক্তমঞ্জরীতে কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটা আকুল হয়ে আছে—তার ওপারে বয়ে যাচ্ছে আত্রাইয়ের নীল ধারা। তারও ওপারে গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথ—ঘন বাঁশ আর আখের বনের ভেতর দিয়ে কোথায় যে দিক চিহ্নহীন দিগন্তে মিলিয়ে গেছে জানতাম না। আর সেই আশ্চর্য পটভূমিতে এই আশ্চর্য লেখাগুলো আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত। মনে হত ওই অজানা পথটা আর এই লেখাগুলোর মধ্যে কী যেন নিবিড় একটা সাদৃশ্য আছে।

প্রথম যখন লিখতে সুরু করি, তখন আমরা মোটামুটিভাবে স্থায়ী বাস্তু বেঁধেছি দিনাজপুরে এসে। ইস্কুলের ছাত্র এবং নীচু ক্লাসের ছাত্র। প্রথম সাহিত্যিকের আসক্তি জ্যামিতিক নিয়মে কাব্য-চর্চার ওপরে গিয়েই পড়ল।

আমি চিরকাল নিরালা মানুষ—কবিতা লেখায় হাত দিয়ে নিজেকে

যেন আরো বেশি সংকুচিত করে ফেললাম। লেখা সম্বন্ধে যেমন সংশয় ছিল, তেমনি ছিল লজ্জা। অপরাধ বোধ তো ছিলই। চোরের মতো লিখতাম—ছিঁড়ে ফেলতাম সঙ্গে সঙ্গেই। নিজের লেখার প্রতি একবিন্দু দরদ ছিল না—ভাগ্যক্রমে সেটা আজও নেই।

নিভৃত সাধনার জন্যে নিভৃত জায়গা দরকার। কোথায় পাওয়া যায় সেটা? খুঁজতে খুঁজতে চমৎকার একটা জায়গা বের করলাম—সে রকম সাহিত্য সাধনার রাজাসন পৃথিবীতে কারো জন্যে জুটেছে বলে আমি জানিনা।

বাড়ীর একপাশের বারান্দায় ভাঙাচুরো কাঠ কুটরো আর কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের একটা স্তূপ ছিল। শুধু স্তূপ বললে কম হয়, সেটা প্রায় ছাদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। তার নীচে বাগান থেকে সংগৃহীত কাঁঠালের একটি পিরামিড, তা থেকে নিঃসারিত হত অপূর্ব সুরভি। বাক্সগুলোর তলায় ইঁদুর স্বেচ্ছাসুখে বিচরণ করত, শব্দে আর গন্ধে বেশ মনোরম একটি পারিপার্শ্বিক যে সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কী। আমি খাতা আর কালি কলম নিয়ে সেই স্তূপ শিখরে আরোহণ করলাম। বাড়ীর লোকের নজর সহজে পড়তনা, যদি হঠাৎ কেউ দেখে ফেলত অনুমান করত কাঁঠাল খাচ্ছি। কাঁঠাল সম্পর্কে বাড়ির কারু কার্পণ্য ছিলনা এবং ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখে ছেলেবেলায় এত ভুগতে হয়েছিল যে সকলে আমাকে ঈশ্বরের করুণার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কাঁঠালের চাইতেও উঁচুদরের রসের সন্ধান পেয়েছি তখন। কেরোসিন কাঠের বাক্সে গলা অবধি ডুবিয়ে দিয়ে বেদব্যাসের কলম চলছে। কবিতা, গান, রাজকুমার মেঘেন্দ্রজিতের সঙ্গে রাজকন্যা সুবর্ণার প্রেম ও মহাযুদ্ধমূলক মহাকাব্য; একলব্যের গুরুভক্তি অবলম্বনে জ্বালাময়ী নাটক—তার খানিকটা গৈরীশী ছন্দে। নিজে পড়ি, নিজে ছিঁড়ি, আবার নতুন করে লিখি। রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মতো নিজের আবির্ভূত জগতে সীমা সংকীর্ণ হয়ে সৃষ্টি এবং বিনয়ের আনন্দ একাধারে উপভোগ করে যাই।

এর মধ্যে আনন্দ লহরী সিরিজের কতকগুলো রোমাঞ্চকর বই পড়ে

ফেলেছিলাম। মাথার মধ্যে ক্রাইম নভেল একটা নতুন উদ্দীপনা এনে দিলে। আমার একক সাহিত্য সংসার থেকে এবারে একটা সচিত্র কাগজ বের করলাম, তার নাম ছিল বোধ হয় 'চিত্র-বৈচিত্র্য'। কোয়ার্টার ফুলস্ক্যাপ সাইজের আট পৃষ্ঠা—আমিই একাধারে সম্পাদক শিল্পী, লেখক, মুদ্রাকর ও পাঠক। তিনটে কবিতা, সম্পাদকীয় এবং রহস্যরোমাঞ্চিত একটি উপন্যাস—প্রথম কিস্তিতেই দুটো ভয়াবহ নরহত্যা ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। এই আমার প্রথম গল্প বা উপন্যাস।

আমাদের দিনাজপুরের সেই বাড়িতে—যেখানে ঘন হয়ে আমের ছায়া পড়েছে, খিড়কির ওপার থেকে আসছে বাতাবী ফুলের মিষ্টি গন্ধ, উঠোনে সারি সারি বোয়ামে ছত্রিশ রকমের আচার রোদে শুকোচ্ছে, ইঁদারার পাশে কাণে রূপোর মস্ত মস্ত গয়না পরা সাঁওতাল ঝি বুধ্‌নি বিকৃত মুখে বাসন মাজছে এবং বাইরে দাদার ঘর থেকে আসছে সঙ্গীত সাধনার কর্ণভেদী কোলাহল, সেই সাধারণ, অতি সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে প্যাকিং বাকসের দুরারোহ পর্বত শিখরে বসে আমি ফুলস্ক্যাপ কাগজের আড়াই পৃষ্ঠায় বন্দুক, বোমা, গুপ্তগৃহ আর নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে ব্যতিব্যস্ত—ভাবতে পারেন! কিন্তু আমি লিখেই চলেছি—'কার সাধ্য রোধে মোর গতি!'

এমন সময় একদিন ধরা পড়ে গেলাম। রিপণের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের একমাত্র ছেলে সুধীন ঘোষ—ডাক নাম বেন্তু—ছিল আমার অন্যতম খেলার সঙ্গী। একদিন সে আমাকে ডাকতে এল মার্বেল খেলবার জন্যে। বললে, চল।

আমি বললাম, না আমি গল্প লিখছি।

—গল্প!—সুধীন তো স্তম্ভিত। ঘটনাটা কিছুক্ষণ সে বিশ্বাসই করতে পারলেনা। বললে, কই দেখি গল্প!

আমি তাকে 'চিত্র-বৈচিত্র্য' থেকে উপন্যাসটা এক কিস্তি পড়ে শোনালাম। মুহূর্তে Doubting Thomas. এর একি পরিবর্তন! দেখি সুধীনের চোখ মুখ আগ্রহে জ্বলছে, মার্বেল খেলার প্রসঙ্গ ভুলেই গেছে সে। সাগ্রহে বললে, তারপর, তারপর?

সম্পাদকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, পরের সংখ্যায় বেরুবে।

সুধীন বললে, তোর কাগজের বার্ষিক চাঁদা কত?

বললাম, নিয়মাবলী কাগজের পাতাতেই দেওয়া আছে। বিজ্ঞাপন একপৃষ্ঠা দু আনা, আধপৃষ্ঠা এক আনা, বার্ষিক মূল্য স ডাক চার পয়সা!

সুধীন তৎক্ষণাৎ প্যান্টের পকেটে হাত পুরে বেষ্টলীনের হাওীভাজা খাওয়ার জন্ম সঞ্চিত একটা এক আনি বার করে বললে, আমি গ্রাহক হবো।

তারপর থেকে কাগজ বেড়ে গেল। হস্তযন্ত্র থেকে দু' কপি কাগজ মুদ্রিত হতে লাগল। কিন্তু রহস্যোপন্যাপটা আমার গ্রাহককে পাগল করে দিয়েছিল। তিনদিন পরে এসে বললে, নাঃ বড্ড বেশী দেরী হচ্ছে। তোর কাগজকে সাপ্তাহিক করে দে।

আমি তখন নতুন উৎসাহে দৈনিক দু সংখ্যা করে বার করতে পারি—সাপ্তাহিক তো কী কথা। আমার প্রথম ভক্ত পাঠকের অনুরোধ উপেক্ষা করা গেলনা। 'চিত্র-বৈচিত্র্য' সাপ্তাহিক হল।

কাগজ কতদিন চলেছিল কিংবা উপন্যাসটা শেষ হয়েছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু সুধীন একদিন কলকাতায় চলে এল-বাবার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখবে। সেই সঙ্গেই বোধ হয় কাগজ আর উপন্যাস বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর আর সুধীনের সঙ্গে দেখা হয়নি—খবরের কাগজে স্পোর্টসম্যান সুধীনের মৃত্যুর খবরও পড়েছি অনেকদিন পরে। কিন্তু আমার সেই প্রথম পাঠকটিকে আজও ভুলিনি—ভুলতেও পারবনা কোনদিন। জীবনে বহু বন্ধু পেয়েছি—আমার লেখা ভালবাসেন এমন দু চারজনও হয়তো আছেন, কিন্তু বাল্যজীবনের সেই মুগ্ধ ভক্তটিকে আর খুঁজে পাবোনা কখনো। আজ এই উপলক্ষে লোকান্তরিত আমার বাল্যবন্ধুটিকে অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জানাবার সৌভাগ্য লাভে কৃতার্থ বোধ করছি।

* * *

দিন কাটতে লাগল। কবিখ্যাতি তখন কিছুটা পাড়ার ছেলেদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কবিতার পর কবিতা জন্মলাভ করছে—ভরে

উঠছে খাতার পর খাতা। বড় জামাইবাবু শ্রীযুক্ত শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহিত আর অনুপ্রাণিত করছেন। বেশ আছি।

এমন সময় দ্বিতীয় গল্পের আবির্ভাব। বেশ নাটকীয় আবির্ভাব। দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল এম-ই স্কুলের একটি ক্লাসে অঙ্ক কষানো হচ্ছে। ক্লাস নিচ্ছেন বাঘা মাষ্টার গোপী রায়—একাধারে অঙ্ক এবং ড্রিল মাষ্টার। নামজাদা খেলোয়াড়, প্রহারে প্রচণ্ড। ছাত্ররাজ্যের বিভীষিকা।

অঙ্কে আমি অনবদ্য ছাত্র ছিলাম। তবু কেন জানি না—গোপীবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হয়তো একান্ত ক্ষীণজীবী বলেই আমার গায়ে হাত তোলাটা পুরুষ ব্যাঘ্রের আত্মসম্মানে বাধত। সহপাঠী মেজদা ছিল ক্লাসের এবং অঙ্কের সেরা ছাত্র—তার খাতা থেকেই হোম টাস্‌ক টুকে নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় চলত।

গোপী বাবুর পিরিয়ডে পেছনের বেঞ্চে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ব্ল্যাকবোর্ড থেকে অঙ্ক টুকবার নাম করে হোম-টাস্কের খাতায় একদিন রামপ্রসাদের মতো গল্প লিখে ফেললাম। পাশে বসে ছিল নরেশ চক্রবর্তী—ন্যাড়া মাথা, কানে আংটি। অঙ্কে সে আমার মতোই পণ্ডিত। সে বোধ হয় গোলাপফুল আঁকবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু হয়ে উঠেছিল কোলা ব্যাং। হঠাৎ দেখি ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে সে বিমুগ্ধ মনে গল্প পড়ছে।

ক্লাশ শেষ হল। নরেশ বললে, অতি চমৎকার গল্পটা তোর। আমাকে দে, বাঁধিয়ে রাখব।

চমৎকার গল্পকে কি হাতছাড়া করা যায়? দিলাম না। বাড়ীতে নিয়ে এসে ছোট বোনদের সংগ্রহ করে গল্প শোনাতে লেগে গেলাম।

বেশ করুণ গল্প। নামটা মনে আছে: পাশাপাশি। ফুলস্ক্যাপ কাগজের তিনপৃষ্ঠা। বিষয়বস্তু হচ্ছে: পাশাপাপি দুটি বাড়ী, একটিতে বড়লোক আর একটিতে দীন দরিদ্র বাস করে। একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় বড়লোকের বাড়ীতে যখন টী পার্টি চলেছে তখন গরিবের ছেলেটি বিনা চিকিৎসায় মারা গেল।

ছোট বোনদের চোখ যখন ছলছল করবার উপক্রম, এমন সময়

একটা বিরাট অট্টহাসি এবং ছন্দোপতন। কখন যে পিসতুতো ভাই ফুচুদা—অর্থাৎ মহেন্দ্রবাবু এসে জুটেছেন টেরও পাইনি। সাহেবী মেজাজের লোকটি, দার্জিলিংএ বাস। সুট পরে থাকেন এবং মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

গল্পের মধ্যে এক যায়গায় ছিল মাংসের কচুরি খাওয়ার কথা। শুনে ফুচুদার হাসি আর থামে না। মাংসের কচুরী! তাও কি হয়? ননসেন্স অ্যাণ্ড অ্যাবসার্ড। রাবিশ!

মাংসের কচুরি তখনও আমি খাইনি—নামটা কোথায় শুনে থাকব। কাজেই আমি দমে গেলাল—নিদারুণ দমে গেলাম। মনে হল এমন ছল করা গল্পটা নিতান্তই প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাতা বগলে করে পালিয়ে গেলাম।—লেখাটাকে কুটি কুটি করে উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায়। অপমানে সেদিন চোখ দিয়ে জলও পড়েছিল।

আমি জানি মাংসের কচুরী হয় এবং ভালোও হয়। আপনাদের আশীর্বাদে গৃহিণী মাংসের কচুরী তৈরী করে অনেকবার খাইয়েছেন এবং আমি হঠাৎ বিপত্নীক না হলে আরও খাওয়াবেন। কিন্তু সেদিন-কার সেই শক আমার গল্প রচনার উৎস মুখে পাথর চাপা দিয়ে দিলে। গল্প লিখতে বসলেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের Ominous rock এর মতো মাংসের কচুরী দুঃস্বপ্ন হয়ে আসে। সুতরাং অব্যাপারেষু মনে করে ও পথ ছেড়ে দিলাম।

* * * * *

কবিতা লিখেই চলেছি। 'মাস পয়লা' পত্রিকার ছোটদের বিভাগে কবিতা লিখে পুরস্কার পেলাম—বুক ফুলে গেল। আস্তে আস্তে বয়স বাড়ল, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলাম। 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রের পাতায় আমার কাব্য প্রলাপগুলো সাদরে পত্রস্থ হতে লাগল। 'দেশের' তৎকালীন সহ-সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য সংসারের universal পবিত্রদা—আমাকে নানা রকমে উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর স্নেহের ঋণ আমার এ জীবনে অপরিশোধ্য।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই-এ পড়ছি তখন। পবিত্রদার পত্রাঘাত এল: গল্প লেখো।

গল্প লিখব—কিন্তু কী লিখি। কিছুদিন আগে ফরিদপুরে থাকবার সময়ে কিছু কিছু গল্প চর্চা করেছিলাম, কিন্তু সেগুলো নিতান্তই গণ্ডীবদ্ধ শৃঙ্খলিতা দেশমাতা সম্পর্কে জ্বালাময়ী রচনা। পবিত্রদার পত্রে বিব্রত হয়ে পড়লাম।

সেই সময়ে বাংলা সাহিত্য জগতে যে সব লেখা আমার প্রাণমন কেড়ে নিয়েছিল সেগুলি অচিন্ত্যকুমারের গল্প, তারাশঙ্করের বিচিত্র একটি ফ্যাণ্টাষ্টিক রচনা—নাম বোধ হয় 'খড়্গ', মনোজ বসুর 'বন-মর্মর' এবং নবাগত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। শেষোক্ত লেখাটি 'ভারতবর্ষে' ক্রম প্রকাশ্য ছিল। মপাসাঁ আর বালজাকের গল্পও তখন গিলতে সুরু করেছি। আমার অতি প্রিয় এই সমস্ত লেখকের সম্মিলিত প্রভাব নিয়ে 'দেশে'র পাতায় আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়ে বেরুল: 'নিশীথের মায়া'। আমার বয়স তখন সতরো থেকে আঠারোর মধ্যে। বয়স সুলভ রোম্যাণ্টিকতার মায়াময় স্বপ্নময় অতীতের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে গল্প আকারে একটা ফ্যাণ্টাসি খাড়া করে তুলেছিলাম।

পবিত্রদা খুশি হলেন। গল্পের জোয়ার এল—কবিতাকে ভুলে গেলাম। 'দেশ থেকে বিচিত্রা' 'বিচিত্রা' থেকে 'শনিবারের চিঠি'—তারপর এখানে ওখানে। শুভার্থী পেলাম শনিগ্রহের সজনীদাকে, 'বিচিত্রা'র উপেন গঙ্গোপাধ্যায়কে। নিজের খেয়ালের খুশিতে লিখে চললাম।

কোনো খ্যাতির আকর্ষণ আমাকে কখনো প্রলুব্ধ করেনি—আমার লেখা কে কী ভাবে গ্রহণ করেছেন, সে কথা ভাবিওনি কোনোদিন। নিজের আনন্দে লিখেছি, কাগজে বেরিয়েছে—যখন মূল্যহীন মনে হয়েছে তখন তাকে আর স্বীকার করিনি। আমার বহু লেখাকেই আমি এইভাবে বিস্মৃতির বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি—শুধু জানি: ফুরায় যা দেরে ফুরাতে।

এরই ধারা আজো চলছে। আমার লেখা যাঁরা ভালোবাসেন, এর পরের কথা তাঁরা জানেন।

* * * * *

এই তো আমার গল্প রচনার পেছনের ইতিহাস। অনেক ছোটখাটো সুখ-দুঃখ, ঘাত-সংঘাত হয়তো এর সঙ্গে মিলে রয়েছে—যার কথা আজ আর মনে করতে পারি না। কিন্তু এ ইতিহাস অত্যন্ত সহজ—অত্যন্ত সাধারণ। আমার পরিচয় যদি আপনাদের কাছে কিছু দেবার থাকে, তা হলে সে আমার জীবনে নয়, আমার গল্পে।

গল্প লিখি—উপন্যাসেও হাত দিয়েছি। তার কতটুকু দাম– জানিনা। অত্যন্ত পরীক্ষিত শক্তি, যা করতে চাই, কিছুই করতে পারি না হয়তো। কিন্তু ব্যর্থতার জন্যে এতটুকু ক্ষোভ করি না। নিজের সীমানা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে কবিগুরুর ভাষায় আমারও এই সান্ত্বনা :

"আমার কীর্তিরে আমি করিনা বিশ্বাস।
জানি কাল সিন্ধু তীরে
নিয়ত তরঙ্গাঘাতে দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।···
···এ বিশ্বেরে ভালো বাসিয়াছি
এ ভালোবাসাই সত্য এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।"

পরিচয়

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—১২৮৯ সালে বগুড়া সহরে এঁর জন্ম। বাঙ্গলা সাহিত্য যখন আদর্শবাদের জড়তায় প্রাণহীন হয়ে পড়েছে সেই সময়ে অসাধারণ প্রতিভা এবং বস্তু-তান্ত্রিক মনোভাবের প্রখরতা নিয়ে নরেশ বাবুর আবির্ভাব। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শুভা' সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। প্রথম লেখা তেরো বছর বয়সে। তারপর বহু বিখ্যাত এবং বহু কুখ্যাত বহু উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাও লিখেছেন। বর্তমানে ব্যবহারজীবী হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতায় থাকেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—১৮৯০ সালে কলকাতায় এঁর জন্ম। অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি সব দিকেই সিদ্ধ হস্ত। কিছু দিনের জন্য সিনেমাজগতে যুক্ত ছিলেন এখন আবার সাহিত্যক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। অতি-সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনাকে নিয়ে গল্প লেখার শক্তি তাঁর অনন্যসাধারণ। তাঁর আধুনিকতম লেখা 'মহাস্থবির জাতক' শরৎ বাবুর শ্রীকান্ত'র মত ব্যক্তিগত টুকরো অভিজ্ঞতার ছবি। বাকপটুতায় তিনি অনতিক্রম্য। প্রথম লেখা 'নিশির ডাক'। কলকাতায় বাস করছেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—১৮৮৪ সালে এঁর জন্ম। কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় সহ সম্পাদকের কাজ করেছেন। এযাবৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, ছোটদের লেখা প্রভৃতি নিয়ে বোধ হয় শতাধিক বই রচনা করেছেন। তাঁর এই উদ্যম বিস্ময়কর। অথচ তাঁর প্রত্যেকটি লেখা সহজ, সরল, জটিলতা-বর্জ্জিত ও মধুর। ব্যবহারিক জীবনে তিনি খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী। আর একটি কথা এখানে বলা যেতে পারে যে তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে সকলেই বিভিন্ন দিকে খ্যাতি-অর্জন করেছেন। বর্তমানে কলকাতায় আছেন।

প্রবোধকুমার সান্যাল—জন্ম ১৯০৭ সালে কলকাতায়। আদি বাস ফরিদপুর। আবাল্য দুঃসাহসী ও সমাজদ্রোহী প্রবোধকুমার একাধিকবার সমুদ্রযাত্রা ও তিনবার ভারত ও নেপাল পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশাল পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি অতি-বিচিত্র ও অতি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাঁর বহু লেখার মধ্যে ভ্রমণ কাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে' বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি অমর স্বাক্ষর। বাল্যকালে আমেরিকা পাড়ি দিতে গিয়ে বর্মা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া জীবনে অমানুষিক কষ্ট নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। অনাহার উপবাস একদিন তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। সৈনিক বিভাগে এবং আরও অন্যান্য বিভাগে, তিনি কাজ করেছেন। বাঙ্গলার প্রথম প্রগতি পত্রিকা 'কল্লোল'এর সঙ্গে বহুদিন তিনি যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে ইনি ঢাকুরিয়াতে আছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৯৬ সালে। বসবাস দ্বারভাঙ্গায়। রাজষ্টেটে কাজ করেন। লিখেছেন খুব কম, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যে খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছেন। প্রথম লেখা বই 'রাণুর প্রথম ভাগ।' বহু প্রশংসিত বই 'নীলাঙ্গুরীয়' সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রে স্থায়ী স্থান লাভ করেছে। চিন্তার স্বকীয়তায় এবং রসরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর হাসির পশ্চাতে কখনও বা ব্যঙ্গ কখনও বা গোপন অশ্রু প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে সেইজন্যেই তাঁর হাসির গল্পগুলি এত প্রিয় হয়ে উঠেছে। গল্প, উপন্যাস ও নাটক এই তিন বিভাগেই তাঁর লেখনীর ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে তিনি নিজেই একটি বিশেষ গোষ্ঠী।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৯০৮ সালে দুমকায়। আদিবাস বিক্রমপুর। বলিষ্ঠ দেহ ও বলিষ্ঠ মনের মানুষ। এই বলিষ্ঠতা তাঁর লেখনীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই সচরাচর মনোবিকার, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, ও অতি স্পষ্ট জীবনবোধের ওপর তাঁর রচনা প্রতিষ্ঠিত। তাঁর লেখার মধ্যে আবেগের স্থান নেই, ভবিষ্যৎ কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নেই অথচ

একটা সুস্থ সবল সত্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। অতি সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেন তা সত্যিই মোহ জাগায়। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম। এক কথায় বলতে মাণিক বাবু একাই, বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি দিক। প্রথম লেখা 'অতসী মামী' কলেজী জীবনে বাজী রেখে এক জায়গায় বসে লেখা। 'পদ্মানদীর মাঝী' সত্যিই চাঞ্চল্য এনেছিল—এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

বুদ্ধদেব বসু—জন্ম ১৯০৮ সালে কুমিল্লায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রথম লেখা কবিতাগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' ও উপন্যাস 'সাড়া' সত্যিকারের সাড়া এনে দিয়েছিল। তারপর, কাব্য, উপন্যাস, গল্প, সমালোচনা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি সকল দিক থেকে বাঙ্গলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করে তুলেছেন। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে এত খ্যাতি ও এত নিন্দা তাঁর মত আর কেউ পান নি। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের পরে এতখানি স্বাতন্ত্র্য ও এতখানি প্রতিভা নিয়ে কোন লেখক বাঙ্গলা সাহিত্যে আসেন নি। অথচ অতি-লাজুক, ছোট্টখাট্টো মিষ্টি লোকটিকে চিনিয়ে না দিলে বোঝা যায় না যে ইনিই বুদ্ধদেব বসু। এককালে 'প্রগতি' কাগজ ঢাকা থেকে সম্পাদনা করতেন। বর্তমানে কলকাতা থেকে 'কবিতা' কাগজ সম্পাদনা ও পরিচালনা করছেন। সত্যিকারের কবি ও শিল্পী মানুষ। আগে অধ্যাপনা করতেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। প্রগতিশীল ও অবাস্তব দার্শনিকতা থেকে মুক্ত মন নিয়ে তিনি সাহিত্যে যে যুগান্তর এনেছেন তাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের মোড় ঘুরে গেছে। এমন কি নিজের ভাবপ্রকাশের জন্য বাঙ্গলা ভাষাকেও তিনি ইচ্ছামত চালনা করেছেন। তাঁর লেখা 'এরা আর ওরা' অশ্লীলতা দোষে বাজেয়াপ্ত হয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৩০৭ সালে বর্ধমানে। পৈতৃক বাস বীরভূম। প্রথম লেখা উপন্যাস 'ঝোড়ো হাওয়া' ঝড়ের মতই বয়ে গেছলো বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে। 'কল্লোল' 'কালি কলম,' ও পরবর্তীকালে 'সাহানা' 'ছায়া' প্রভৃতি কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল গ্রামে বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কেটেছে। তাই সমাজের

যারা সবচেয়ে নীচের স্তরে—কোল, ভীল, মুটে মজুর, সাঁওতাল কুলিদের নিয়ে তিনি তাঁর লেখা সুরু করেন এবং অতি সহজেই চরিত্র ও ঘটনার সাবলীল স্বাভাবিকতায় ও বেদনাময় সহানুভূতিতে পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করে তোলেন। বহু নির্যাতনের মধ্যেও তাঁর এই শিল্পীমন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, এইটেই তাঁর বিশেষত্ব। বাঙ্গলার ছোট গল্পের আসরে প্রগতিবাদের প্রথম পথ প্রদর্শক তিনি। তবে তাঁর গল্পগুলি একটু বড় ধরণের। বর্তমানে সিনেমাজগতে যুক্ত হয়ে আছেন। এদিক দিয়ে তাঁর সৃষ্টি সমালোচনা সাপেক্ষ হলেও জন-প্রিয়তার দিক থেকে তিনি সর্বোচ্চে। কলকাতায় আছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৩০৩ সালে ২৪ পরগণায়। পৈতৃক বাস যশোহর। তার সম্বন্ধে সব চেয়ে বড কথা এই যে একটি মাত্র বই লিখে এত নাম অর্জন করতে আজ পর্যন্ত কারুকে দেখা যায় নি। সে বই ‘পথের পাঁচালী।’ বাঙ্গলার পল্লীর শ্যামল আবহাওয়ায় যে অপূর্ব কাহিনী গড়ে উঠেছে সেই কাহিনী প্রতি বাঙ্গালীর প্রাণকে স্পর্শ করে। তাই ‘পথের পাঁচালী’ পড়েন নি এমন পাঠক বাঙ্গলা দেশে বিরল। ছোট গল্প ‘মেঘ মল্লার’ সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথা খাটে। জীবনে তিনি স্কুলমাষ্টারী, ষ্টেটের ম্যানেজারী থেকে আরম্ভ করে নানা কাজ করেছেন এবং নানা দেশ ঘুরেছেন। কিন্তু তাঁর লেখা অতি শান্ত, অতি সংযত এবং মিষ্টি ভাষায় অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী—জন্ম ১৯০২ সালে মুর্শিদাবাদে। ‘আত্মশক্তি’, ‘বৈকালী’, ‘নবশক্তি’, ‘বসুমতী’, ‘নায়ক’ ‘বাংলার কথা’ ‘আনন্দবাজার’ প্রভৃতি নানা পত্র পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী। ১৯৩০ সালে ‘নবশক্তির’ সম্পাদক হিসাবে তিনি কারাবরণ করেন। তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস ‘বন্ধনী’ খুব সমাদর পায়। শ্রেষ্ঠ লেখা ‘শৃঙ্খল’। রক্ষণশীল মনোভাবের লেখক হলেও তাঁর লেখার মধ্যে বিপ্লবী নরনারী, সাংবাদিক, মেসের বাসিন্দা প্রভৃতি চরিত্রগুলি বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানে কৃষক পত্রিকার সম্পাদক।

শিবরাম চক্রবর্তী—জন্ম ১৯০৫ সালে কলকাতায়। বাল্যকাল কেটেছে পল্লীগ্রামে। মহাত্মাগান্ধীর আদর্শে স্কুল ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন। কংগ্রেসের কাজে চাষী মজুর ও দুঃস্থদের মাঝে অনেক কাল কাটিয়েছেন। এঁর সব লেখাই প্রায় হাস্যরসমূলক ও ব্যঙ্গপ্রধান। কি ছোটদের, কি বড়দের ইনি সমানভাবে হাসাতে পারেন। ভাষার ওপর, বিশেষ করে Punning এর ওপর তাঁর অসাধারণ দখল। মানুষ হিসাবে এবং বন্ধু হিসাবে তিনি অতি সুন্দর। সব সময়ে হাসির তুফান তুলে বসে আছেন। মনটি সব সময়েই তরুণ। গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক সবকিছুই লিখে থাকেন।

মনোজ বসু—জন্ম ১৩০৮ সালে যশোহরে। পল্লী গ্রামে মানুষ। পূর্ববঙ্গে অবাধ প্রাচুর্য ও সুষমার মধ্যে সাহিত্য বোধের প্রথম উন্মেষ। তাই প্রথম দিকে মনোজবাবু রোমান্টিক এবং তাঁর ভাষা লিরিক। সেই দিক থেকে তাঁর গল্প গ্রন্থ 'বনমর্মর' অসামান্য এবং বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীস্থান পাবাব যোগ্য। তাঁর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে শরৎবাবুর পরে পল্লীবাঙ্গলার পটভূমিকায় এইরকম দরদী মন নিয়ে তিনি ছাড়া এত স্পষ্টভাবে এবং সার্থকভাবে কেউ আর গল্প রচনা করেন নি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে ভুল হয় যে শরৎবাবুর লেখা পড়ছি। অথচ সেই মনোজবাবুই যখন উগ্র জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনার পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর লেখার মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। তাই মনোজবাবুর আধুনিকতম পরিচয় 'ভুলি নাই'—রচয়িতা হিসাবে। আগে ইনি কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। বর্তমানে কলকাতার শ্রেষ্ঠতম পুস্তক প্রকাশকদের অন্যতম হয়ে উঠেছেন। এঁর মিষ্টি স্বভাব অতি সহজেই মনকে অভিভূত করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—জন্ম ১৯০৫ সালে কাশীতে। পরবর্তী জীবন ঢাকায় ও কলকাতায়। এঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'পাঁক' ষোল বছর বয়সে লেখা। তারপর পর পর উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সিনেমার গল্প প্রভৃতি সব দিকেই হাত দেন। জীবনে মাষ্টারী, বিজ্ঞাপন লেখা,

কাগজ সম্পাদনা প্রভৃতি অনেক কিছুই করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে দুটি কথা জোর দিয়ে বলতে হয়—একটি তাঁর সাহিত্য প্রতিভা আর দ্বিতীয় তাঁর অমায়িক স্বভাব। বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রগতির প্রথম পথ প্রদর্শক হলেন তিনি। এবং আজও একথা সকলে স্বীকার করেছেন যে সেই আসরে তাঁর শ্রেষ্ঠস্থান অবিচলিত। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'প্রথমা' পড়ে ভুল হয় রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা লেখা বলে। আবার তাঁর আধুনিকতম লেখা গল্প (তেলেনীপোতা আবিষ্কার) পড়লে ইচ্ছে হয় এটা ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করে জগতের সমালোচকদের সামনে বুক ফুলিয়ে হাজির করতে। সিনেমার গল্পেও একাধিকবার তিনি শ্রেষ্ঠ লেখকের পদক পেয়েছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য চিন্তাশক্তির মৌলিকত্বে। অথচ কত সংযত ভাষায় এবং আবেগহীন স্রোতে তাকে তিনি প্রকাশ করেন। আর তাঁর মধ্যে যে মিষ্টি মনের বাসা আছে সে মন আজকালকার কৃত্রিমতার দিনে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে কলকাতায় থাকেন।

জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)—জন্ম ১৮৯৬ সালে যশোহরে। কলকাতা ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অল্প দিন সাহিত্য জগতে অবতীর্ণ হলেও যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছেন। প্রধানতঃ রসরচনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁর হাসির মধ্যে সুস্থ ও স্বতস্ফূর্ত ভাব আছে। মানুষ হিসাবে অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁর ভারীক্কী চেহারা দেখলে বিশ্বাস হয় না যে ইনিই রসরচনায় সিদ্ধকাম জ্যোতির্ময় ঘোষ। প্রথম গ্রন্থ 'শুভশ্রী'। ইনি একজন বিশিষ্ট গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক। বর্তমানে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ। কলকাতায় স্থায়ী বাস।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র—জন্ম ১৯০৯ সালে। কাশীতে লেখাপড়া করেছেন। অতি অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চা করছেন। তাঁর লেখার মধ্যে বেশ একটা সহজ সরল ঘরোয়া ভাব আছে। সেজন্যে তাঁর লেখা পড়ে বেশ একটা ঝরঝরে আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁর গল্প গ্রন্থের মধ্যে 'ভাড়াটে বাড়ী' খুব সমাদর লাভ করেছে। অনুবাদ সাহিত্যেও ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এঁর চরিত্রের একটি

বিশেষত্ব এই যে ভ্রমণে তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে—নেশা বললেও চলে। ইনি বাঁ হাতে লেখেন। বর্তমানে কলকাতার একটি বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশনীর অংশীদার। ঢাকুরিয়ায় থাকেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৩২৫ সালে দিনাজপুরে। আদি বাস বরিশাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এবং কৃতী ছাত্রের অসামান্য মেধা নিয়েই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর বিস্ময়কর আবির্ভাব। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের গোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছেন। সেখানেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার বোধ হয় বেশী দেরী নেই। প্রথম লেখা উপন্যাস 'উপনিবেশ' গল্প 'বীতংস' তাঁর অসাধারণ প্রতিভার ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা কবিতার মধ্য দিয়ে। তাঁর সুন্দর চেহারা, এবং শান্ত, বিনয়ী ও নিরহঙ্কার স্বভাব সত্যিই বন্ধু হিসেবে অত্যন্ত আনন্দ দেয়। তাঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। যে কোন বই সম্বন্ধে যে কোন সময়ে তিনি পরিচয় দিতে পারেন। শান্ত স্বভাব হলেও কথাবার্তার মধ্যে তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ঝলসে ওঠে। বর্তমানে তিনি কলকাতায় অধ্যাপনা করছেন। আধুনিক সেরা লিখিয়েদের মধ্যে তিনি বয়সে সব চেয়ে ছোট এবং মস্ত বড় হবার সম্ভাবনার আকর স্বরূপ। তাঁর লেখার মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট।